প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বগত ও দর্শনগত প্রেমভাবনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মধ্যযুগে সাহিত্যের যাত্রাপথে নানা বিপর্যয় ও দুর্যোগের অতি দুর্গমপথ অতিক্রম করে এক বৈচিত্রময় সাহিত্যিক পটভূমিতে পদার্পণ করেছে। মূলত চৈতন্য আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রী:) পরবর্তী সময় বৈষ্ণব তত্ত্ব দর্শনের ক্ষেত্রটির সূত্রপাত ঘটে। মধ্যযুগীয় বাতাবরণে উঠে এল বৈষ্ণবধর্মের এক নবতম আঙ্গিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বৈষ্ণব' কবিতায় যে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শকে উন্মোচিত করলেন, সেখান থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী বা প্রকীর্ণ শ্লোকের বাইরেও রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সুবৃহৎ ভুবন, যেখানে একথাই অনুভূত হয়েছে বৈষ্ণব রসগীতি দৈবী পরিবেষ্টনিকে অতিক্রম করে মানবতত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়ে এক প্রেমগীতিকায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে, যা কিনা এই সম্পদকে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপায় ভূষিত করেছে। 'হরিবংশ' থেকে 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী যেমন পাওয়া যায়, তেমনি রচনাগুলিতে লৌকিক ও মানবিক দিক বিধৃত হয়েছে। এছাড়া 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিতাবলী', 'সুক্তিমুক্তাবলী', হালের 'গাথা সপ্তশতী', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল', 'স্তুতিগ্রন্থ'-এর রচনাবলীর সঙ্গেও বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় ভাবনায় সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এসব সাহিত্যিক রচনায় নানা প্রেক্ষিতে ভগবান বিষ্ণুই হোক, আর শ্রীকৃষ্ণই হোক তাঁর একটি প্রতিরূপগত প্রতিচ্ছবি অন্বেষিত হয়েছে।

যেহেতু বিষ্ণুকে অবলম্বন করেই বৈষ্ণবীয় ভাবনা বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব, তাই যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব বলতে শুধুমাত্র তাঁদের ধর্ম সম্প্রদায়কেই বোঝানো হত না, বরং বৈষ্ণব বলতে 'বিষ্ণুর আশ্রিত' বোঝানো হত।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পর যে বৈষ্ণবতত্ত্বের সূচনা হয় তা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। তাই বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বে অনুপ্রবেশের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যে বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বিশেষ স্থান আছে তার উৎস মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যে তথ্য পাই তা হল আলংকারিক দণ্ডীর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে সর্বপ্রথম তিনি 'পদসমুচ্চয়' এই অর্থে 'পদাবলী' শব্দটির প্রয়োগ করেন। অন্যদিকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর সংগীত শ্লোকে এই একই অর্থে 'পদাবলী'র প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতায় বহু প্রাচীন ভারতীয় প্রেমগীতিহার রচনায় যে ধারাবাহিকতা রয়েছে এগুলিও একান্তভাবেই মানবিক লৌকিক

কালের যাত্রাপথে রাধাকৃষ্ণ লীলা সমুদ্রে পদার্পণ করেছে। তবে মূলত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর মধ্য দিয়েই বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা। তিনিই সর্বপ্রথম বিশিষ্ট অর্থে 'পদাবলী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব কবিতাকে তিনি কোমল কলাবতী যুবতীর ন্যায় তুলনা করেছেন। জয়দেবের কাব্যে একদিকে মধুর কোমলকান্ত রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রেম সংগীত ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের কৃষ্ণলীলার পদেও মধুরকোমল কান্ত প্রেমময় মূর্চ্ছনা শ্রুত হয়েছে। তাই 'পদ' শব্দটির ব্যবহার পূর্ববর্তী হলেও রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব জয়দেব গোস্বামী বিরচিত 'গীতগোবিন্দম্' থেকেই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা, নবদ্বীপের নীলাচলের গৌরাঙ্গলীলা নিয়েই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিশাল সম্ভার। তাই তত্ত্বের প্রেক্ষাপট আলোচনার সময় আমাদের সম্মুখে উঠে এসেছে চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক প্রাচীন কবিবর্গের রচনা যা ছিল শৃঙ্গার রসাশ্রিত। জয়দেবও পরোক্ষে হরিস্মরণের কথা জানালেও প্রত্যক্ষে বিলাসকলার কৌতূহল নিবৃত্তির কথাই স্মরণ করিয়েছেন। চৈতন্য আবির্ভাবের পরই বৈষ্ণব পদাবলী একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক মতবাদের দ্বারা চালিত হয়। আর এই সময়টিই ছিল বৈষ্ণব পদাবলীর এক প্রকার তাত্ত্বিক যাত্রাপথের সূচনাকাল স্বরূপ। এই আলোচনা থেকে আমরা একথা অনুধাবন করতে পারি যে, চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি প্রচুর পরিমাণ পদাবলী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, এমনকি বড়ু চণ্ডীদাসের পদেও তিনি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এক অভূতপূর্ব মূর্তি প্রতিবিম্বিত করেছেন। বাংলা ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটিকে পথিকৃৎ বলা হলেও একটি কথা খুব সহজেই বলা যায় চৈতন্য সমকাল ও চৈতন্যের আবির্ভাবে পদাবলী সাহিত্যের গৌরবময় কাল রূপে বিবেচিত হয়েছে। চৈতন্যের আবির্ভাবে পদাবলী সাহিত্য মাধুর্যমণ্ডিত এবং যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হয়ে সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। তাইতো 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ বলা হয়েছে—

''যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ।।
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।
... ...
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম।।
... ...

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন।।
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নামপ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে।।"[১]

এভাবেই কালের যাত্রাধ্বনির এক ভিন্ন পথমার্গে সম্পূর্ণ ভিন্নতর রূপকে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। আর এই তত্ত্বকে ব্যাপ্তি দিলেন রূপ, সনাতন, ও জীব গোস্বামীর মত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও দার্শনিকবৃন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সূত্রপাত তত্ত্বজ্ঞানের ছায়ালোকে। এই জ্ঞানের অধিকারীদের পরম তত্ত্বজ্ঞানী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টির বিশ্লেষণে উঠে আসে— জ্ঞানীর কাছে তিনিই ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনিই পরমাত্মা স্বরূপ, ভক্তের কাছে তিনিই ভগবান। জীব গোস্বামী অদ্বয় জ্ঞানকেই 'দ্বৈতজ্ঞান' রূপে চিহ্নিত করেছেন। ব্রহ্মর ত্রিবিধ শক্তিকে আমরা চিনতে পারি 'স্বরূপশক্তি' বা 'পরাশক্তি', 'তটস্থাশক্তি' এবং বহিরঙ্গে 'মায়াশক্তি' নামে। এই স্বরূপ বা ব্রহ্মশক্তি এক ও অভিন্ন। স্বরূপ শক্তিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি— চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এই চিৎ বা চিত্ত শক্তির আনন্দাংশের নাম 'হ্লাদিনী', সৎ অংশের নাম 'সন্ধিনী' এবং চিদ্ অংশের নাম 'সম্বিত'। বিষয়টিকে তালিকায় প্রদর্শিত করা হলো—

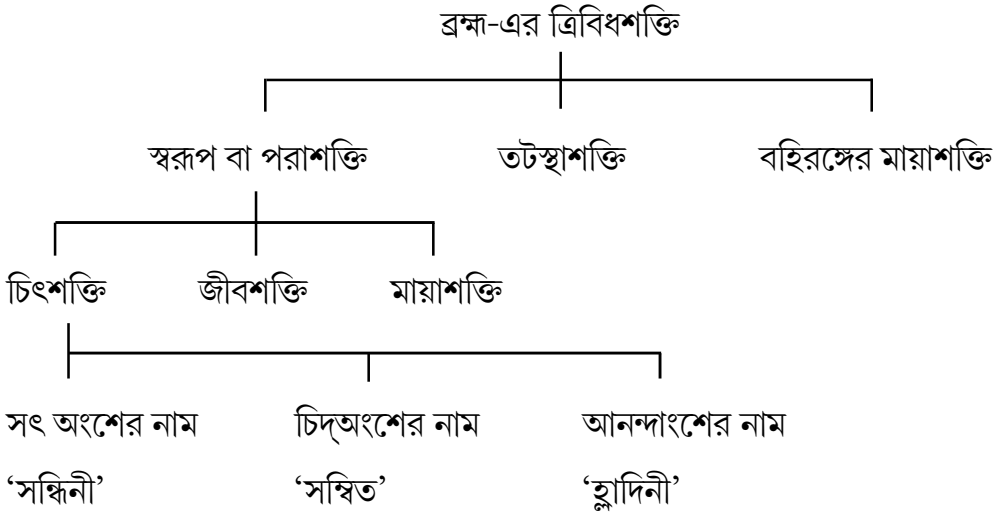

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অপ্রাকৃত দেহধারী, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যেন ভগবানের অংশ। আর সেই ভাবনার অভাবনীয় গতিপথে উঠে এসেছে এই সাহিত্যের অন্যতম দার্শনিক তত্ত্ব। নিম্নলিখিত আলোচনায় বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনের বিস্তৃত পটভূমিকে উত্থাপন করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব:

'কৃষ্ণ' শব্দটি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ' ও 'উপনিষদ' এ উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে কোন দৈবী অর্থে শব্দটির ব্যবহার স্বীকৃত হয়নি যা একান্তই বর্ণের কৃষ্ণত্বকে বোঝাতে উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য নানাবিধ সংস্কারে শব্দটির মধ্যে দৈবী মহিমা আরোপিত হয়েছে। যদু বংশীয় মতে কৃষ্ণ দ্বারকাধিপতি। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এ তিনি দৈবকীনন্দন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পশুপালকদেবতা। এই সকল উৎসের মধ্য দিয়ে তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। তিনি একদিকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এবং অন্যদিকে 'অখিল রসামৃত সিন্ধু'। তিনিই পরমাত্মা, অনন্ত, অসীম। চিৎ শক্তি রূপে জীবাত্মা তারই অংশ বিশেষ, কিন্তু তারা মায়া শক্তির বশীভূত হওয়ায় অনেক সময় কৃষ্ণ মহিমা আস্বাদনে বঞ্চিত রয়ে যান।

এই তত্ত্বটির আলোচনা আমরা পেয়েছি 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র আদি লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের কবিরাজ গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর সর্বশক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে বলে তিনি পরমেশ্বর এবং স্বয়ং ভগবান। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সকলের আদি-অনাদি এবং সকল কারণের কারণ। পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ রূপে তাঁর ত্রিশক্তিতে জগৎ মোহিত—

১. সৎ— সকল স্বরূপে বিরজিত।

২. চিৎ— পরম চৈতন্য প্রকাশিত।

৩. আনন্দ— সকল মাধুর্যময় প্রেম সত্তার আস্বাদন।

অর্থাৎ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী কৃষ্ণের নরোত্তম লীলা সর্বব্যাপক। তাঁর রূপ ও গুণের মাধুর্য এত বেশি যে তা সর্ব প্রাণীকুলকে আকর্ষিত করে। এমনকি, ভগবান স্বয়ং সেই মাধুর্যের আস্বাদন লোভে চঞ্চল হয়ে পড়েন।

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর স্বরূপ। তিনি সকল অবতারের মূলে; আবার তিনি সেই কারণ সমূহের নিষ্পত্তির মূলে। তাই তিনি একদিকে 'সর্ব অবতরী' এবং 'সর্বকারণ প্রধান'। 'গীতা'য় বর্ণিত তিনি 'পরমব্রহ্ম', অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। জগতের সকল জীবকুল তারই আশ্রয়ে আশ্রিত। তাই তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান এই তিনটি স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপের বৈচিত্র্য স্বরূপ।

১. জ্ঞানমার্গের উপাসক— ব্রহ্ম স্বরূপ।
২. যোগমার্গের উপাসক— পরমাত্মা স্বরূপ। → শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ স্বরূপ
৩. ভক্তিমার্গের উপাসক— ভগবান স্বরূপ

তাই শ্রীকৃষ্ণের একই বিগ্রহে এই তিন রূপের সাক্ষাৎ মেলে। বিষয়টিকে আরো এক ধাপ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়— ব্রহ্ম স্বরূপে তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, নিত্য, শাশ্বত, পূর্ণ। এই ব্রহ্মস্বরূপে তিনি পার্থসারথী হয়ে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের মাধ্যমে নিজেকে দেখিয়েছেন; আর কলিযুগে গৌরাঙ্গ স্বরূপে। এমনকি, ভক্তরা বিভিন্ন যুগে তাঁকে বিভিন্ন ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন পেয়েছেন। বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই তাঁর পূর্ণতম শক্তির প্রকাশ বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে ভগবান স্বরূপের ব্যাখ্যায় বলা যায় স্বরূপ বা 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সংবিৎ' এই তিনটি গুণই ভগবান সত্তায় বিরাজিত। কোথাও ব্রহ্মরূপী ভগবান সগুণ, কোথাও তিনি নির্গুণ। ভগবান কৃষ্ণের স্বরূপে তিনি একদিকে সত্য, শিব, সুন্দর শক্তির উপাসক, অন্যদিকে জগৎ কল্যাণের সর্ববৃহৎ আকর। ব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্তার গুণ তার মধ্যে বিরাজিত। তিনি অনন্ত রস বৈচিত্রী। তিনি রসময় ব্রহ্ম, তিনি চিরনবীন, বহু প্রাণের আনন্দধারার বার্তা-বাহক তিনি। প্রেমের দেবতা রূপে, অনিন্দ্য সুন্দর দেহকান্তিতে নর-নারী পতিব্রতা শিরোমণি, অতি সাধারণ থেকে সাধারণ ভক্ত এমনকি 'সাধিকারাধা'; প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আলংকারিক দ্যুতি সুমোহিত সৌন্দর্য সুষমায় প্রেম মূর্চ্ছনায় আকর্ষিত তথা সমর্পিত হয়েছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'- এ তাই স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, তাঁর রূপের এক কণিকায় সমগ্র বিশ্বজগৎময় সর্বপ্রাণী আকর্ষিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাই কোন কামনা-বাসনা দ্বারা লাভ করা যায় না। তাকে প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা গায়ত্রী মন্ত্রে ধ্যানস্থ হয়ে সাধনা এমনকি নিষ্ঠা, ভজন, দীক্ষা ও সকল শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। তাইতো নবদ্বীপ লীলায় রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহে শ্রীচৈতন্য ভগবৎ প্রেমনাম ও তিন সুখ আস্বাদনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রূপে মুখ্যত প্রেমরস আস্বাদন ও রাগ মার্গের ভক্তি প্রচার নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেখানে তিনি রসিক শেখর। এই করুণাধারা বর্ষণই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানতম গুণ। তাঁর এই করুণার জন্যই তিনি ভক্তের প্রীতি রসকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ভক্তের আনন্দ বিধানের হেতু তিনি তা আস্বাদন করেন। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 'রসৌবৈসঃ'। অর্থাৎ আস্বাদিত বস্তুই হল রস। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব ব্যাপক এই রস আস্বাদনের অধিকারী ছিলেন। আর এই রস আস্বাদনের নিমিত্ত এক অপূর্ব লীলা খেলার আয়োজন। এই লীলা ক্ষেত্রই পরবর্তী সময়ে 'ধাম' নামে উল্লিখিত হয়েছে। আর কৃষ্ণের এই লীলারস আস্বাদনের তাগিদ তাঁকে পরম মাধুর্যময় রূপে প্রতিভাসিত করেছে। তাঁর সমস্ত লীলাই ঐশ্বর্য মাধুর্যেরই অঙ্গীভূত। ঐশ্বর্যের প্রতিটি কণিকা মাধুর্যমণ্ডিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐশ্বর্য মধুর রূপে বিরাজিত। মহাপ্রভুই তাঁর এই মাধুর্যের কথা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে এনেছিলেন। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন— ঐশ্বর্য ভগবত্তার সার নহে, মাধুর্যই

ভগবত্তার সার। তিনি যেহেতু সর্ব ব্যাপক তাই পৃথিবীর প্রতিটি অনু-পরমাণুতে তিনি বিরাজমান। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন— তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়, এই বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় কৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্যের ফলেই নির্মিত সত্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করুণা ও ভক্তবৎসল গুণে সর্বময় গুণান্বিত। অব্যক্ত নয়, ব্যক্ত শক্তির মধ্যে এই গুণ সমাহিত। কৃষ্ণের ভক্ত বৎসল গুণের অভিব্যক্তির সময় তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, তিনি নিজেই ভক্ত পরাধীন। তিনি সকল করুণাধারার আধার হওয়ায় তাঁর নামের সামান্যতম অধিকারী ব্যক্তিকে তিনি জগতের সকল বন্ধন মুক্তির পথ দেখান। চৈতন্য যেহেতু কৃষ্ণের অবতার। সুতরাং চৈতন্যদেবের হাত ধরে মানুষ কৃষ্ণ রূপী মর্ত্য মানবের সংস্পর্শে এক অসীম আনন্দমার্গে পদচারণা করেছে, একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। 'কৃষ্ণতত্ত্ব' আলোচনায় কৃষ্ণের ব্রহ্ম, ভগবান, ভক্ত, রস প্রমুখ নানাবিধ বিষয়ের পর তাঁর লীলাকেন্দ্রিক আরো বহু বিষয় এই তত্ত্বের অঙ্গীভূত। তিনি মূলত দুরকম লীলায় অভ্যস্ত।

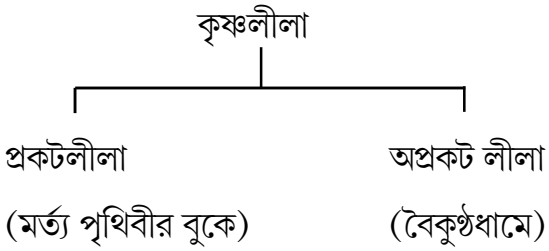

মূলত যুগের প্রয়োজনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন লীলায় অংশ নিয়েছেন। যুগে যুগে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, অধর্মের বিনাশে, ধর্মসংস্থাপনের হেতু ভগবান বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ নানা অবতারে আবির্ভূত হয়েছেন। এই 'লীলা' মূলত 'খেলা' অর্থেই ব্যবহৃত। এই লীলার মধ্যে নরোত্তম লীলাই হল সর্বব্যাপক। প্রকট লীলায় নানাবিধ অবতারে তিনি মায়াধীশ জীবকে সর্ব বিপদ থেকে মুক্ত করতে এই যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। 'ব্রহ্ম সংহিতা'য় তাই স্পষ্ট বলা হয়েছে—

''ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম।।''[২]

অন্যদিকে অপ্রকট লীলায় তিনি বৈকুণ্ঠ অধিবাসী। এই লীলা তিনি প্রকাশ্যে করেন না। সে সময় জীবের কাছে তাঁর অনন্ত মহিমা অধরাই থেকে যায়। যুগের প্রয়োজনেও লীলারস আস্বাদন হেতু পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে তিনি প্রকট লীলায় আত্মনিবেদন করেছেন। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলায় আছে 'বৈভব লীলা'—যেখানে তাঁর অঙ্গরেণুর দ্বারা অন্যান্য অবতারের সৃষ্টি হয়েছে। 'স্বাংশ লীলা'-য় অবতার আবির্ভাবের সৎ উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে ভগবান

সৎ ও সাধুজনকে পরিত্রাণের নিমিত্ত পৃথিবীতে এসেছেন। 'বিলাস লীলা'-য় আনন্দ, সম্ভোগ, লীলারস উপভোগের নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েছেন। 'আবেশ লীলা'-য় মহাপুরুষের প্রতিমূর্তিতে তিনি তাদের মধ্যে নিহিত, এ ভাবনাকে প্রতিকায়িত করা হয়েছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায়— 'শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব' হল শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অবস্থানকে, তাঁর লীলা খেলাকে সুস্পষ্ট অবয়বের হেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এর একটি সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশিকাতে 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব'-এর নির্যাসরূপে উঠে আসে—

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

- সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
- সর্বঅবতারী
- সর্বকারণ প্রধান
- পরমব্রহ্ম
- পরমাত্মা
- ভগবান
- একমেবাদ্বিতীয়ম্
- অখিল রসামৃত সিন্ধু।
- চিরনবীন প্রেমের দেবতা।
- ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রতীক।
- করুণাধারার ও ভক্তবৎসল অবতার।
- প্রকট, অপ্রকট, বৈভব, স্বাংশ, বিলাস ও আবেশ লীলার প্রতিমূর্তি।

এই তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক থেকে এক অপার মহিমাময় প্রতিচ্ছবি ও শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ স্বরূপকে প্রকাশ্যে স্পষ্টতা দিয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরাধা যখনই কৃষ্ণের পাশে থেকেছেন তখনই তার মাধুর্য পূর্ণ রূপে বিকশিত হয়েছে। তাইতো তিনি স্বয়ং ঈশ্বর রূপে এত সহজে এই ধরাতলে পদধূলি দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই জীবজগৎকে প্রভূত সংকট থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর আমরা 'শ্রীরাধাতত্ত্ব'-এ মনোনিবেশ করতে চলেছি।

রাধাতত্ত্ব:

বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু বা নায়িকা হলেন শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপা। প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি মহাভাব স্বরূপা, সর্বগুণ-খনি, কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি। বহুকান্তা ব্যতীত কৃষ্ণের লীলারসের পূর্ণ আস্বাদন সম্ভব নয়। সে কারণে রাধা বহু কান্তারূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তথা জীবনসঙ্গী হয়ে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলারসের আস্বাদন করেন। তাই বলা হয় 'রাধাতত্ত্ব'-এ রাধা শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব স্বরূপিণী। তিনি কৃষ্ণসুখে তাৎপর্যময়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রাধাপ্রেম কৃষ্ণের আশ্রয়ী, অন্যদিকে রাধার প্রেম কৃষ্ণের আশ্রয়ী হওয়ায় তার বহিঃপ্রকাশ বৈষ্ণব কবিতাকে

নানা আঙ্গিকে রাধাকেন্দ্রিক রূপে সমৃদ্ধ করেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হওয়া বৈষ্ণব সাহিত্য একদিকে প্রাক্‌চৈতন্য ও উত্তরচৈতন্য যুগে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগে রাধার প্রেম ছিল লৌকিক আত্মানুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু উত্তর চৈতন্যযুগের রাধা-প্রেম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, দেবীমহিমা কেন্দ্রিক। শ্রীরাধার লৌকিক মহিমা সেখানে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যপ্রেমানুভবে মিলিত হয়ে মহাভাব স্বরূপে পরিণতি পেয়েছেন।

রূপ গোস্বামীর কৃত বহু খ্যাত 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রেয়সীদের দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত 'স্বকীয়া', দ্বিতীয়ত 'পরকীয়া'। 'স্বকীয়া' প্রেম সমাজ স্বীকৃত। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষাই হল এই প্রেমের ভিত্তি। যেমন রুক্মিনী, সত্যভামার কৃষ্ণপ্রীতি। অন্যদিকে সমাজের অবাঞ্ছিত, অস্বীকৃত প্রেম হল 'পরকীয়া প্রেম'। যেখানে দেহসর্বস্বতার ঊর্দ্ধেও এক অনন্য প্রেমমহিমা বিরাজমান। যেমন— ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী সহ সকল গোপীগণ ও শ্রীমতি রাধা। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কৃষ্ণদাস স্পষ্ট জানিয়েছেন—

''প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ।।''[৩]

এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ প্রেমে সকল বাধা অতিক্রম করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাবার হেতু তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিজ অস্তিত্বকেও তিনি এর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন, কৃষ্ণের জন্য তিনি কলঙ্কিত হতেও পিছপা হননি। নিজ অস্তিত্ব, নিয়তিকে তিনি কৃষ্ণের নিয়তির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। জাতি-কুল-মান বিসর্জন দিয়ে 'কৃষ্ণবাঞ্ছাকল্পতরু'-র কাছে তিনি জীবনের সকল প্রেমপাত্র হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। তাইতো কৃষ্ণকান্তা সহ সকল ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে এমনকি কৃষ্ণ-অনুগত সাধ্বীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীই শ্রেষ্ঠ।

''গোবিন্দনন্দিনী রাধা-গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব-সর্বকান্তা-শিরোমণি।।
... ...
কৃষ্ণাবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে।।''[৪]

কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। সকল সৌন্দর্য, মাধুর্য ও কান্তির মূল আধার।

রাধা পূর্ণ-শক্তি আর কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত। তাঁরা অভেদরূপে কেবলমাত্র লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি, হ্লাদিনীর মূর্তবিগ্রহ রূপে রাধাকৃষ্ণ পৃথক মূর্তিতেও এই লীলা খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি, জীবজগৎকে অপার শান্তি প্রদান করেছেন।

''রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমান।।''[৫]

এমনকি, যুগে যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেয়সী রূপে নানা প্রতিরূপে লীলারস আস্বাদনের সহায়কারিণী হয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ 'সচ্চিদানন্দ' রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ 'স্বরূপশক্তি', 'জীবশক্তি', 'মায়াশক্তি' রূপে। এই 'স্বরূপশক্তি' বা 'অন্তরঙ্গা শক্তি'র মূল আধার হলেন শ্রীরাধা।

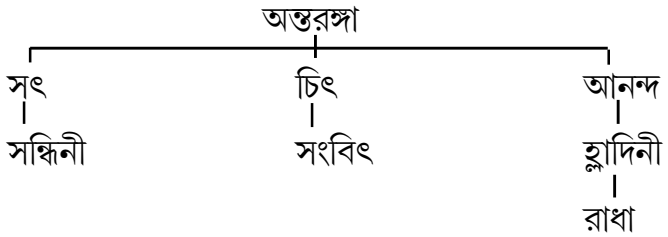

অর্থাৎ আনন্দ বা হ্লাদিনী অংশে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজে আনন্দ অনুভব করেন। জগতের যে সকল জীব সর্বসুখ বর্জন করে কৃষ্ণপ্রেমে আমোদিত হতে চান, তিনি তাদের সকলকে তাঁর চরণে আশ্রয় দেন। শ্রীরাধিকা হলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেম। কিন্তু জীবকুলের সঙ্গে সেই কৃষ্ণেরই পরোক্ষ প্রেম। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ তার লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা সত্তায় সর্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মূলত উভয়ের মধ্যে অভেদ আছে বলেই শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখণ্ড রস স্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি অখণ্ড রস-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণভগবান, রাধা তাঁর মূল কান্তাশক্তি; তিনি দ্বারকার মহিষীগণ, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ এবং অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপের কান্তাগণের অংশিনী।

শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের মূল কান্তাশক্তি তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূতা মর্ত্যলক্ষ্মীর অংশভূতা, স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী নামে, বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী মহালক্ষ্মীর অংশরূপে, সরস্বতী ও ভারতীর দ্বিবিধ মূর্তিতে এবং বৃন্দাবনে রাসের পূর্ণতমা দেবী রূপে শ্রীমতী রাধা পূর্ণ বিরাজমান। তাই তিনি কোন সাধারণ রমণী নন। তাঁর প্রেম সম্পর্কশূন্য অপ্রাকৃত প্রেম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহকারী শক্তি। তাই তিনি কোন পৃথক সত্তা নন। এখানেই তাঁরা অভেদ। একই শক্তির অবিচ্ছিন্ন দৈবরূপ।

এক আত্মা দুই দেহধারী। শ্রীকৃষ্ণের সকল কামনা পূরণের নিমিত্ত তিনিই শ্রীরাধা। তাঁর অমলিন প্রেম সাগরে অবগাহন করে কৃষ্ণ নিত্য সুখী। তাই তিনি বারবার এই মহিমান্বিত প্রেমে আকৃষ্ট হন। কখনো বা বিহ্বল হয়ে পড়েন।

''না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।।''[৬]

এই বন্ধনহীন প্রেমাকর্ষণে কৃষ্ণ বহির্মুখী হতে পারে না। তাই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীব, কৃষ্ণসুখ থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের প্রেম 'নিকষিত হেম' হবার সুযোগ পায় না। তাই রাধাই হয়ে ওঠেন কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি। আবার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অংশিনীও শ্রীরাধা। জগৎ সৃষ্টির সময় শ্রীরাধা থেকেই মহাবিষ্ণুর উদ্ভব। এমনকি 'পদ্মপুরাণ'-এ এই তথ্যের উল্লেখ আছে। 'পদ্মপুরাণ'-এর 'পাতালখণ্ড'-এ শ্রীরাধার প্রতি নারদের উক্তি থেকে জানা যায়— তিনি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, পরাশক্তিরূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। সকল ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি সব তাঁরই অংশ। তিনি সর্ব-ঈশ্বরী, পরব্রহ্ম এবং ভগবানের সকল মায়া, মূর্তবিগ্রহ ও সর্বগুণ ও সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্বয়ং জীব গোস্বামীও এই তথ্যের প্রমাণ দেখিয়েছেন। তাইতো রাধা মুখে কৃষ্ণনাম, নয়নে কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি, নাসিকায় কৃষ্ণের অঙ্গসুবাস, শ্রবণে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি সর্বদাই স্ফূরিত হয়েছে।

তাই ভগবান কৃষ্ণ ঈশ্বর হয়েও প্রেমের বশীভূত। যে ভক্ত তাঁকে যত বেশি আস্বাদন করে, সে ভক্তের নিকট তাঁর দুর্বলতা তত বেশি। এদের মধ্যে রাধার প্রেমের বিকাশ সর্বাধিক হওয়ায় তাঁর প্রেমের কাছে কৃষ্ণের বশ্যতাও সর্বাধিক। 'পূর্বরাগ', 'রূপানুরাগ', 'মান', 'অভিমান', 'আক্ষেপানুরাগ' প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই রাধার জীবনে কৃষ্ণের প্রতি অপার ব্যাকুলতা। কৃষ্ণ তাই রাধাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবত স্বরূপে বিহার কালে রাধা বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মী রূপে তার লীলায় সঙ্গ দেন। তাইতো 'উজ্জ্বলনীলমণি' তে বলা হয়েছে চন্দ্রাবলী ও রাধার মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর একমাত্র তিনিই। বেদধর্ম, কুলধর্ম, আত্মীয়-স্বজন, আর্যপথ সব কিছু ত্যাগ করে রাধাসহ গোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণসেবা করে থাকেন, কৃষ্ণের পক্ষে এককভাবে সে সেবা ফিরিয়ে দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তিনি গোপীসহ রাধার কাছে সর্বদাই ঋণী। তাই রাধার প্রেম মাধুর্যের জ্যোতিতে স্বয়ং মদনদেব পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। আর রাধার প্রেম বৈচিত্র্যেই কৃষ্ণের সৌন্দর্য, মাধুর্যকে ক্রমশ বিকশিত করে। এমনকি, গৌরাঙ্গ অবতারে কৃষ্ণ রাধার ভাবকান্তি গ্রহণে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি।

''এই-প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।

আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।।
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণেক্ষণ।।
... ...
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।।"[৭]

শ্রীকৃষ্ণ গৌরহরি রূপে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে রাধাভাবদ্যুতি অবলম্বন করে নিজরূপ আস্বাদনে তাই সর্বদাই উন্মুখ থাকেন। তাই অন্তিম পর্যালোচনায় একথাই বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরে বৃন্দাবনলীলা হল প্রকট লীলা, যা লোকচক্ষুর সামনে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে নিত্য বৃন্দাবনলীলা হল অপ্রকটলীলা যা লোকচক্ষুর অন্তরালে আয়োজিত হয়। রাধা সকল আনন্দ, বিরহ, অপবাদ, প্রতিকূলতাকে মুহূর্তে অতিক্রম করে বৃন্দাবনের সকল লীলায় অংশগ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ ভক্তি প্রেমের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ রাধা, কৃষ্ণ তাকে বহিরঙ্গে এক অপার শক্তি দিয়ে জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভগবান কৃষ্ণের প্রেমমহিমা প্রচারের নিমিত্তই শ্রীমতি রাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরিশেষে 'রাধাতত্ত্ব'কে নির্দিষ্ট ছকে বিভক্ত করলে যে কয়েকটি তথ্য উঠে আসে তা হল—

রাধাতত্ত্ব :

- প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
- কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।
- লৌকিক ও আধ্যাত্মিক রাধা প্রেম
- রাধা স্বকীয়া-পরকীয়া প্রেম।
- শ্রেষ্ঠ ব্রজকুলবতী নারী।
- কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
- কৃষ্ণের অন্তরঙ্গাহ্লাদিনী শক্তিরূপ।

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে এই সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ পথরেখা নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছে। পাশাপাশি তত্ত্বটি আধুনিক কথাসাহিত্যের নানা গতিপথে নারীহৃদয় সঞ্জাত প্রেমপাত্রকে কিভাবে উচ্ছ্বলিত করেছে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তার অনুসন্ধানই বিশেষ বিবেচ্য।

গৌরতত্ত্ব :

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের লীলা প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে চৈতন্যদেব

হলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্বরূপ। এই যুগল অবতারত্বের মধ্যেই চৈতন্যদেবের অবতারত্বের গূঢ় রহস্য অন্তর্নিহিত আছে। চৈতন্যদেব মূলত কৃষ্ণের অবতার রূপে প্রেম ভক্তিনাম প্রচারের জন্য এই মর্ত্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একদিকে প্রেমনাম অন্যদিকে যুগধর্ম প্রচারের হেতু তাঁর আবির্ভাবের উৎসটি এই গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্পষ্টতই উদ্ধৃত হয়েছে—

''শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা—
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।''[৮]

অর্থাৎ শ্রীরাধা যে অদ্ভুত প্রেমমহিমা আস্বাদন করে তৃপ্ত হন, তাঁর অনুভব কেমন? এরই আস্বাদন লোভে চৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শচীগর্ভসিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণই একদিকে ভগবান রূপে অন্যদিকে পরিকর রূপে লীলারস আস্বাদন নিমিত্ত বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে এবং নবদ্বীপে শচীনন্দন প্রতিকৃতিতে অবতীর্ণ হন। অখিলরসামৃতসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ত্বের অধীন। প্রেমের চরম ভাব অর্থাৎ 'মাদনাখ্য মহাভাব' যেহেতু শ্রীরাধাতেই প্রকাশিত তাই শ্রীরাধাই প্রেমের একমাত্র ও অন্যতম অন্তিম আশ্রয়স্থল। কৃষ্ণই রাধার এই প্রেমের বিষয়।

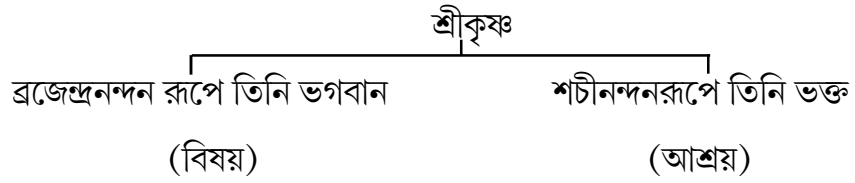

তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে কৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করতে হয়। আর সেই লীলারসেরই বিষয় হলেন তিনি। শচীনন্দন রূপে, গৌররূপে নবদ্বীপে সেই লীলার আস্বাদন করেন, সেক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয়রূপই সেখানে প্রাধান্য পায়। এই ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ লীলা উভয় লীলার সমবায়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের পূর্ণতা প্রাপ্তির খাতিরেই শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যেই রসিক শেখরত্বের পূর্ণতম প্রকাশ ঘটে।

চৈতন্যদেবের এই লীলার দুটি পর্যায়, একটি প্রকট, অন্যটি অপ্রকট। শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহন রূপের অধিকারী গৌরাঙ্গসুন্দর রূপে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় মত্ত থাকেন। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে যে লীলা সাঙ্গ করেন, তিনিই পরবর্তীসময়ে কলিযুগে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেব হয়ে মর্ত্যলীলা পরিসমাপ্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সকল রসের পাত্রকে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। প্রকট লীলায়

তিনি 'মধুর ভাব' বা 'পরকীয়া ভাব' সন্নিবেশিত লীলাবৈচিত্র্য আস্বাদন করেন। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হয়ে প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন করেন, অন্যদিকে শ্রীরাধা ও গোপীগণের সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার মুগ্ধ করতে থাকেন, কৃষ্ণ এই রসাস্বাদনে বারবার তাদের কাছে ঋণী হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে পারেন না। তাঁর এই অতৃপ্ত বাসনা ক্রমশ দুর্দমণীয় হয়ে উঠতে থাকে; এটিই কৃষ্ণের স্বমাধুর্য আস্বাদনের বাসনা রূপে পরিগণিত হয়। চৈতন্যদেব এই তত্ত্ব প্রথমে দাস্যরূপে পরে কান্তারূপে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভে উপলব্ধি করেন। আবার কখনো তিনি কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে রাধা সঙ্গ প্রাপ্তির হেতু ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি কখনো কৃষ্ণ কখনো রাধাভাবে ভাবিত হন। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর সে অর্থে কৃষ্ণভাবে রাধাপ্রাপ্তির চিন্তাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের জন্যই সকল আবেগ, অনুভূতি ও অবিরল অশ্রুপাত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণই সকল সৌন্দর্য মাধুর্যের আধার, তাঁর এই মাধুর্য আস্বাদন করেই তাঁর ভক্ত শ্রীরাধা সর্বাপেক্ষা বেশি সুখী ছিলেন। তাই তো তিনি কৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদনে প্রকৃত অর্থে সমর্থা। রাধার এই অনুভব কৃষ্ণ মাধুর্যকে অধিক সুমধুর রূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। গোপীদের দেখে কৃষ্ণের শোভা বৃদ্ধি পেলেও শ্রীরাধার আনন্দের ন্যায় বাকি সখীদের প্রেমানুভব অতীব তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। এই মাধুর্যের তাৎপর্য বা কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য দেখেই কৃষ্ণের হৃদয়ে স্বমাধুর্য আস্বাদন স্পৃহার উদ্রেক হয়। এছাড়াও কৃষ্ণের হৃদয়ে আরো দুটি বাসনা জাগ্রত হয়, তাই কৃষ্ণের স্বসুখ বাসনাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—

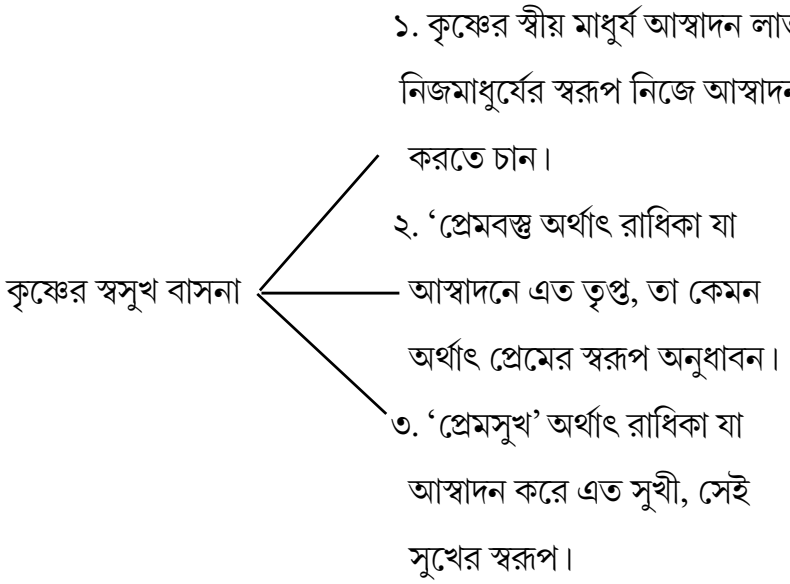

এই তিনটি বাসনাই তাঁর ব্রজলীলায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই প্রেমের স্বরূপ চরমতম

রূপে একমাত্র শ্রীরাধাতেই প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণের বাসনাপূরণ ও তাকে সুখী করার জন্য শ্রীরাধা মাদনাখ্য মহাভাবে ভাবিত হয়ে নিজ নাম সার্থক করেন। সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রসিকশেখর রূপের পূর্ণবিকাশের পথকে সর্বাংশে সার্থক করে শ্রীরাধা নিজ অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাকে তথা তার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেন। আর এই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গৌরসুন্দর অর্থাৎ চৈতন্যদেব কৃষ্ণস্বরূপে আশ্রয়লাভ করেন। তাই তো তিনি রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা করে অন্তর্ধান হন, সেই কৃষ্ণই কলিযুগে গৌরসুন্দর রূপে নবদ্বীপ লীলায় আবির্ভূত হন। ব্রজলীলার অপূর্ণ বাসনা পূরণের হেতু স্বরূপই গৌরলীলার সূচনা, কারণ রাধার মহাসুখের অনুভব বোঝার জন্য কৃষ্ণের কাছে তা অনির্ণেয় ও অপ্রাপ্য ছিল। যে প্রেমে তিনি বিষয়, রাধা আশ্রয়, সেই আশ্রয় জাতীয় প্রেমের হেতুই চৈতন্যদেব নবদ্বীপে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। গৌরাঙ্গের বাইরে রাধা, অন্তরে তাই সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান।

''রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি;
সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।।''[৯]

এই যুগধর্ম প্রবর্তনের হেতু গৌরলীলায় নামসংকীর্তন করা হয়েছে। তাই পরিশেষে একথাই বলা যায়— কৃষ্ণ অবতারের পর গৌর অবতারের আবির্ভাবের তিনটি কারণ—

''রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকরি-ধরি তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।।''[১০]

একদিকে ভক্তি প্রচারের জন্য ব্রজলীলায় কৃষ্ণের আবির্ভাব, অন্যদিকে রস নির্যাস আস্বাদনের অপূর্ণতা থেকে রাধাভাব কান্তি নিয়ে নবদ্বীপ লীলায় গৌররূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব। এই অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তির যে সংকল্প, তাই গৌরলীলায় তত্ত্বরূপে আবর্তিত হয়েছে। রাধাভাবে নিজ মাধুর্য, লীলারস আস্বাদন ও তিনটি অতৃপ্ত বাসনা সহ নাম সংকীর্তন প্রচার ও প্রেমপ্রদান সহ কৃষ্ণভজনের আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পথকে চৈতন্যদেব গৌরলীলায় দেখিয়ে গেছেন। চৈতন্যের দিব্যভাব, রাধিকার অধ্যাত্মমূর্তি সহ 'কৃষ্ণতত্ত্ব' ও 'রাধাতত্ত্ব'-এর সম্মিলনেই যে 'গৌরতত্ত্ব'-এর ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত তা আমরা পাঠকবর্গ সর্বাংশ সার্থক রূপেই অনুভব করতে

সমর্থ হয়েছি।

গৌরতত্ত্বের দিক :

- ব্রজলীলায় কৃষ্ণ (বিষয় স্বরূপ)
- নবদ্বীপ লীলায় কৃষ্ণের চৈতন্যরূপ (আশ্রয় স্বরূপ)
- চৈতন্য অবতারের তিনটি অতৃপ্ত বাসনা।

  ক. কৃষ্ণের নিজমাধুর্য আস্বাদন।

  খ. রাধার প্রেমানুভব আস্বাদন।

  গ. রাধা প্রেমসুখের স্বরূপ আস্বাদন।
- মর্ত্য পৃথিবীতে হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন ও প্রিয়জন উদ্ধার।
- কৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্বের সম্মিলনেই গৌরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

সখীতত্ত্ব :

'চৈতন্যচরিতামৃত'র মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে 'সখীতত্ত্ব'-এর কথা উল্লিখিত আছে। এই সখীরা হলেন শ্রীরাধার সখীবর্গ। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন বিরহলীলায় সখীরা নানাভাবে কৃষ্ণকে সহযোগিতা করে থাকেন, রাধার প্রেমকে মহাভাব রূপে উন্নীত করার ক্ষেত্রে গোপীদের সহায়তা ভিন্ন অসাধ্য ছিল। সংবাদ বহন করার সময় দূতীর ভূমিকায় উপনীত হওয়া, মিলনের স্থান ও সময় সুনির্দিষ্ট করা, রাধাকে সুসজ্জিত করে কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থাপন করা, তাঁর প্রণয়কে পূর্ণতা দেওয়া, প্রণয়ের নব নব আঙ্গিক বা বৈচিত্র্য উপলব্ধিতে কৃষ্ণকে সহায়তা করা; এমনকি, কখনো বিরহিনী রাধার প্রতি প্রেমাধিক্য বর্ষণে, কখনো বা কৃষ্ণসুখে আত্মবিসর্জন দেওয়াই ছিল সখীগণের অন্যতম প্রধান কার্য। এই সখীগণের অন্যতম ছিলেন চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈবা, অনুরাধা প্রভৃতি। এই সকল সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রয়োজনে নিজেকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। প্রত্যেক সখীদের দলভুক্ত ছিলেন আরো সহস্র সখী। শ্রীকৃষ্ণ এদের নিয়েই যমুনা বিলাস থেকে শুরু করে রসবিলাসে মত্ত ছিলেন; এই গোপীসঙ্গ কৃষ্ণের প্রতি রাধার ঈর্ষাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। মূলত কৃষ্ণের সকল সখীগণের মধ্যে রাধাই ছিলেন সর্বপ্রধান। রাধাসহ সকল গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারটি ভাগে সেবা দিয়েছিলেন। তাই এই সখীগণই রাধাকৃষ্ণ লীলাকে সার্থক করে তোলেন—

''রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।।

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।।”[১১]

তাইতো বলা হয়েছে, বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সখীগণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শ্রীরাধার ন্যায় তারাও শ্রীকৃষ্ণের মন আকর্ষণ করতে সক্ষম। সখীগণই কৃষ্ণের লীলা বিস্তারের প্রেক্ষাপট রচনা করে। পূর্বের তত্ত্ব থেকে অবগত হয়েছি যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় হলেন শ্রীরাধা। এই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন এবং লীলায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন সখীগণ। তাদের একমাত্র কাম্যবস্তু হল কৃষ্ণকে সুখী করা, তারা শুধু তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চান, কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম তাদের কাম্যবস্তু নয়। তারা শ্রীরাধার সমপ্রাণা সখী। সখীদের কাছে রাধার কোনো কিছুই গোপন নেই। এই সখী সাহচর্যই কৃষ্ণের রাধা আস্বাদনকে বা তাদের লীলাকে পরিতৃপ্তির দিকে নিয়ে যায়। এটি আসলে কামনার সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়, সখীগণ ও কৃষ্ণের এই মিলন খেলা হ্লাদিনী শক্তির বৈচিত্র্য মাত্র। সখীদের সঙ্গে দর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি থাকলেও সেই প্রেমে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না বললেই চলে।

‘‘অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট।
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট।।
সহজে গোপীর প্রেম-নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম।।”[১২]

পরস্পরের প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রেম তাই ছিল সখীদের প্রেম প্রকাশের একমাত্র প্রধান মার্গ। সেই মার্গ ছিল স্বসুখ বাসনা শূন্য। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার স্বরূপ। শুধুমাত্র কৃষ্ণকে তৃপ্ত করাই নয় ব্রজবালিকারা নিজ সুখের নিমিত্ত এই প্রীতির অভিব্যক্তি ঘটান। তাদের এই আনুগত্যের মধ্য দিয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রেম পুষ্টিলাভ করে। তাই তো তারা প্রেম বিগ্রহ, হ্লাদিনীর অনুরূপা শক্তি। আত্মপ্রীতির স্থানই সেখানে প্রধান। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করতে সহায়তা করে, তেমনি সখী হৃদয়ের প্রেম, তাদের আনন্দশক্তি শতসহস্র বাধা ও তিরস্কার সহ্য করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করতে চায়। তাই সখীগণের প্রেমে আপাতদৃষ্টিতে কামনার চিহ্ন প্রকাশিত হলেও প্রকৃত পক্ষে তা একান্তই বহিরঙ্গে বিরাজমান। যেখানে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হতে পারে। কিন্তু প্রেমের অন্তর্বর্তী শক্তির দ্বারা তারা তাদের ঈশ্বরকে পেতে চান, যা তাদের সকল দেহ সর্বস্ব কামনার উর্দ্ধে অবস্থানকারী লভ্যবস্তুকে তাদের নিকটে সহজলভ্য করে তোলে। তাইতো শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রীতিকেই তারা তাদের পরিতৃপ্তির কারণ বলে মনে করেন। কারণ উভয়েই কৃষ্ণকে পেতে চান। তাইতো

রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনে সখীরা যে সুখ পান কৃষ্ণের সঙ্গে সখীদের মিলনেও শ্রীরাধাও সেই একই সুখ পান। উভয়ের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ সুখ বিধান। তারা নিজেদের সুখকে তাই কৃষ্ণের সুখের কাছে গুরুত্বহীন মনে করেন। অর্থাৎ কামনা দীর্ঘস্থায়ী নয়, প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেমই মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

''কাম-প্রেম, দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-ধরে 'প্রেম' নাম।।''[১৩]

কামনা প্রসঙ্গে বলা হয়— দৈহিক সুখ, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, আত্মসুখ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি মূলক বিষয়গুলি কামের গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর এই কামনা খুব সহজে পরিত্যজ্য বস্তু নয়, আত্মসুখ বিশিষ্ট যে কোন বিষয় এই কামনার অন্তর্গত। এই সকল বস্তুর প্রতি কৃষ্ণপ্রাণাগত সখীদের কোন লালসা নেই। আত্মসুখে তারা নিজেকে নিমজ্জিত করতে চান না। কৃষ্ণ প্রাপ্তির বাসনায় তাদের নিজেদের দুঃখ সেখানে সুখরূপে তারা অনুভব করেন। ব্রজগোপীদের কৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগ তাদের কৃষ্ণ প্রেমে উচ্ছ্বসিত করতে সহায়তা করে। তাই তো কামকে বলা হয় মায়ার অধীন। আর প্রেম তা যেন চিদ্ শক্তির অধীন। গোপীদের এই প্রেমে তাই স্বসুখবাসনার যেমন কোন চিহ্ন নেই, ঠিক তেমনি কামনা বাসনার কোন লেশমাত্র নেই। কৃষ্ণের প্রতি নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ বা ভালোবাসাই হল গোপীগণের প্রধানতম লক্ষ্য বস্তু।

''গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত।।
... ...
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয়, গোপী রূপগুণে।
তাঁর সুখে, সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে।''[১৪]

এই সেবা বা আত্মসমর্পণ মূলক মনোভাবই গোপীপ্রেমের সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করে। নিঃস্বার্থ ও গভীর আন্তরিক নিষ্ঠার মাধ্যমেই তারা অনির্বচণীয় আনন্দের অধিকারিণী হয়ে থাকেন। তাই তো ভগবান কৃষ্ণ তাদের প্রেমময় সেবায় যতটা তৃপ্ত হন; তার চেয়েও কয়েকগুণ তৃপ্তি গোপীগণ পেয়ে থাকেন।

''গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।

তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।”[১৫]

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, গোপীগণের এই সীমাহীন প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অতি দীন তুচ্ছ মনে করেন। তাই তো কৃষ্ণপ্রীতি হল বিষয় আর গোপীরা হল এই প্রেমের আশ্রয়। তাই তারা কৃষ্ণের আনন্দ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ মনে আনন্দ অনুভব করেন। একারণেই ব্রজলীলায় গোপীপ্রেমে পরাজিত হয়ে গোপীপ্রেমের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের জন্য রাধাভাবে অবতারত্ব গ্রহণ করেন। গোপীগণের এই প্রেম আস্বাদনের প্রতিজ্ঞা একসময় ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা যে শুদ্ধাত্মা নিয়ে মিলন কামনায়, সকল বন্ধন মুক্ত করে, সংসার ছিন্ন হয়ে কৃষ্ণকে প্রীত করেছেন, কৃষ্ণের দ্বারা সেই অত্যাশ্চর্য ত্যাগ কোনভাবেই সম্ভবপর হয়নি। তাই সংক্ষেপে ‘গোপীতত্ত্ব’-এর সারাৎসার করলে উঠে আসে—

সখীতত্ত্ব:

- রাধাকৃষ্ণের প্রেমপটভূমি নির্মাণে সহায়তা করা।
- বিশুদ্ধ প্রেম প্রদান করা।
- কামনার সকল নাগপাশ ছিন্ন করা।
- রাধার কৃষ্ণপ্রীতিতে নিজ আত্মতৃপ্তিবোধ।
- সকল মোহবন্ধন ত্যাগ করে কৃষ্ণসেবায় জীবন উৎসর্গ করা।
- সৎ আন্তরিক নিষ্ঠা, সীমাহীন প্রেম ও ভগবান রূপী শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবায় জীবন উৎসর্গই এই তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ইঙ্গিতায়িত করেছে। যেমন কামনা নয় প্রেমই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। পরবর্তী তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের পরম-স্বরূপের নিদর্শনমূলক দিকের পর্যালোচনা করা হবে।

পরম-স্বরূপ তত্ত্ব:

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান তিনি তাঁর ঐশ্বরিক মহিমার দ্বারা নিজেকে ভক্তবৃন্দের কাছে পূজার পাত্ররূপে উপস্থাপিত করেন। তাত্ত্বিক বৈষ্ণবীয় দর্শনের স্থান থেকে তিনিই হলেন পরমশক্তি। আদিযুগ থেকেই তিনি বিগ্রহ রূপে সর্বত্র বিরাজিত এবং মূর্তিমতী স্বরূপশক্তির প্রতিভূ। সম্পূর্ণ শক্তির পূর্ণতম বিকাশের অভিব্যক্তি তার মধ্যেই আভাসিত। অনাদি কাল থেকেই স্বতন্ত্র বিগ্রহ রূপে, হ্লাদিনীর পূর্ণতম জ্যোতির্কণা রূপে, ষড়ৈশ্বর্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে, শ্রীরাধার শক্তির শক্তিমান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণতমা শক্তিরূপিনী শ্রীরাধার অন্যদিকে পূর্ণতম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের এই মিলন

ক্ষেত্রটিই 'পরম-স্বরূপ তত্ত্ব'কে স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রিতিষ্ঠিত করেছে। তাই 'পরম-স্বরূপ তত্ত্ব' বলতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকেই সুচিন্তিত করা হয়েছে।

তাইতো শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলায় স্বরূপ শক্তির এক বিশেষ ভূমিকা সর্বদাই ক্রিয়াশীল। তিনি যখন গোকুলে মাতা যশোদার সঙ্গে বাল্যক্রীড়ায় উন্মুখ থাকেন বা গোপিনীদের সঙ্গে প্রেমলীলা আস্বাদনে মত্ত থাকেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্য মাধুর্যের বিকশিত সম্মোহিনী শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাধার অখণ্ড সাহচর্যেই শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রস স্বরূপত্বের বিকাশ ঘটে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকেই তাই 'পরম-স্বরূপ' রূপে নির্ণায়িত করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন একদিকে সখা, মাতা যশোদার সঙ্গে বাল্যলীলারত, আবার অন্যদিকে ব্রজগোপীদের সঙ্গে এমনকি শ্রীরাধার সঙ্গে অভাবনীয় বিলাসলীলায় মেতে ওঠেন বলেই তিনি রসিক শিরোমণি। যা তাঁর রস স্বরূপকে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে প্রতিকায়িত করে। তত্ত্বটিতে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ক্রিয়া ভগবান লীলাখেলার মধ্য দিয়েই সম্পাদিত করে থাকেন। লীলাই হল রসস্বরূপের একান্ত নিজস্ব বস্তু। এই লীলাই আসলে মর্ত্যধামের সঙ্গে পরমব্রহ্মের সংযোগ সূত্রকে অনেক বেশি দৃঢ়রূপে উপস্থাপিত করেছে। জীবের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে পৃথিবীতে তার বেড়ে ওঠা, কর্ম করা, কর্মফল ভোগ, ঈশ্বর সেবা বা তার কৃপাপাত্র হওয়া, সাধন-পূজন-ভজনের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া এই সবই লীলার অঙ্গীভূত। তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তের এই আকূতি বা তার স্নেহপ্রাপ্তির তাৎপর্যের প্রকৃত অর্থ হল 'পরম-স্বরূপ' বা ব্রহ্মের সান্নিধ্য প্রাপ্তি।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার ঐশ্বর্যময় ব্যাপ্তির তত্ত্বটি আরো এক ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ সহায়তা করেছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় লীলামহিমার আরো এক অন্যতম স্থান হল বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনেই কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের পূর্ণতম শক্তির বিকাশ। ব্রজের এই ঐশ্বর্য মাধুর্যই কৃষ্ণের অপার বৈচিত্র্যময় লীলাকে সকলের নিকট আস্বাদ্যরূপে গড়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে অপার আনন্দের ধারা চিরবর্ষিত বৃন্দাবন লীলায় বা ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ মাধুর্যের ও ঐশ্বর্যের যুগল সম্মিলিত মিলনক্ষেত্র রূপে বিবেচিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠলোকের ন্যায় ঐশ্বর্যলীলার অনাবৃত প্রকাশ সেখানে নেই বলেই ব্রজধামে তার এক অন্যরকম মহিমা বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের সর্বতো ও নিঃস্বার্থ সেবাই মূলত প্রকৃত ধর্মাচরণ। ব্রজধামে তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবা দানই তাঁর লীলা আস্বাদনের পরম চাবিকাঠি; যেখানে সকল রূপ-রস- আনন্দ-মাধুর্য পরিপুষ্টি লাভ করে ঐশ্বর্যশক্তিই রসশক্তিতে পরিণত হয়। এই সামগ্রিক আলোচনায় একথাই বলা যায় যে, ঈশ্বররূপী রস স্বরূপই 'পরম-স্বরূপ তত্ত্ব'-এর প্রাণস্পন্দন

জাগ্রত করেছে। সুতরাং রসের পূর্ণতম বিকাশের মানদণ্ড নির্ধারণে রাধাকৃষ্ণের যুগল সম্মিলনের 'পরম-স্বরূপ তত্ত্ব'-এর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই পরমস্বরূপের মধ্য দিয়েই তারা একে অপরের সঙ্গে আজীবন লীলারসে আবদ্ধ হন।

পরম-স্বরূপ তত্ত্ব:

- শ্রীকৃষ্ণই পরমপূজনীয় ঈশ্বর।
- সকল শক্তির স্বরূপ।
- পূর্ণশক্তির পরাকাষ্ঠা।
- রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির সম্মিলন।
- শ্রীকৃষ্ণ সখা, পুত্র, প্রণয়ী রূপে স্বরূপত বিদ্যমান।
- শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির আধার হল তত্ত্বটি।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত তত্ত্ব :

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের আলোচনায় তত্ত্বটির উত্থাপন হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। রাধাকৃষ্ণের বিলাস লীলার মধ্য দিয়েই মহাপ্রভুকে রামানন্দ যা বর্ণনা করেন, সেটি আসলে 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-এর সূচনালগ্ন বলে চিহ্নিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সর্বঅবতারী, তিনি সর্ব অবতারের আশ্রয়স্থল। তিনি সব কিছুর মূল কারণ, তাঁর দেহাবশেষ সৎ, চিৎ, আনন্দের অধীন। নন্দনন্দন রূপে তিনি ব্রজের অধিপতি। এই ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে তাঁর মধ্যে পূর্ণব্রহ্মত্বের চরম বিকাশ, তাই তো তিনি 'পরমব্রহ্ম'; এভাবেই তিনি ঈশ্বর হয়েও মর্ত্যপৃথিবীর ভক্তদের সেবায় নিষ্ঠায় প্রীত হয়ে নানা রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে তাদের সঙ্গে ঐশ্বর্য মাধুর্যের লীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রেয়সীর বিন্দুমাত্র সঙ্গ লাভের জন্য তাকে নিভৃত নিকুঞ্জে একাকী দিনাতিপাত করতে হয়েছে। এমনকি, অশ্রু বিগলিত নেত্রেও তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। শ্রীরাধার সান্নিধ্য লাভের এই মহান মহিমা মহাপ্রভুর সম্মুখে রামানন্দ নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি। মহাপ্রভুর প্রবল উৎকণ্ঠায় তিনি যখন রামানন্দের কাছে আরো অধিক জানতে চেয়েছেন তখনই সবিস্তারে উঠে আসে 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত' তত্ত্বের প্রসঙ্গটি।

তত্ত্বটিতে রামানন্দ শ্রীরাধার প্রেম মাহাত্ম্যের বৃহৎ প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল সম্মিলনেই যে 'পরম-স্বরূপ তত্ত্ব'টির ভিত্তি; সেই তত্ত্বেরই আরো এক ধাপ অগ্রসর হলেই আমরা বর্তমান তত্ত্বটির গভীরে প্রবেশ করতে পারি। যুগল সম্মিলনে উভয়েরই ব্যক্তি

সত্তার বিলোপ ঘটে তাঁরা এক সত্তায় মিলিত হন। আস্বাদক ও আস্বাদ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। রাধাকৃষ্ণ উভয়েই প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ রামানন্দ প্রেমের এই ঘনীভূত রূপকেই 'প্রেমবিলাস বিবর্ত' রূপে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর টীকাভাষ্যে 'বিবর্ত' বলতে 'বিপরীত' বুঝিয়েছেন। শ্রীজীব গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে 'বিবর্ত' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন বিবর্ত হল 'পরিপাকঃ'। অর্থাৎ প্রেমের পরিপক্কতাই হল 'বিবর্ত' শব্দের অর্থ। কৃষ্ণ রাধা এই তত্ত্বে একান্তই নায়ক নায়িকা রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একপ্রকার মহাভাব উপস্থিত হয় এই পর্যায়ে। মিলন ও বিরহ উভয় পরিস্থিতিতেই শ্রীকৃষ্ণের রাধার প্রেমে চরম উন্মত্ততাই হল এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভিত্তি। মহাভাবের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে বলা হয়েছে—

'' 'কৃষ্ণকে আহ্লাদে'— তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই-শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
... ...
হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম সার— 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।।''[১৬]

অর্থাৎ প্রেমের চরম প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ রাধাতেই খুঁজে পেয়েছেন; তাঁর আনন্দ, চিত্তপ্রশান্তি, রসধারা প্রভৃতির প্রেমময় আখ্যান অনুভবের মহাভাব অর্থাৎ প্রেমের চরম তথা পরম সারবস্তু তিনি রাধা ঠাকুরাণীর মধ্যেই দৃশ্যত অনুভব করেছেন। কৃষ্ণের এই রাধা প্রীতি বা রাধার কৃষ্ণ প্রীতি উভয়কেই দিব্যোন্মাদ এবং বিরহোন্মাদের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রামানন্দের একটি উক্তি স্মর্তব্য—

''পহি লহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল— অবধি না গেল।।
না সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মম মনোভব পেষল জানি।
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি।।''[১৭]

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের এই প্রণয় দু'নয়নের মিলনের ফলেই সম্ভব, কোন দূতির সহায়তায় নয়। এ যেন এক অভাবনীয় পূর্বরাগ-অনুরাগের প্রেক্ষাপট রচনা করে। এই প্রণয় দিন প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সীমা থেকে অসীমের দিকে ধাবিত হয়, নিত্য নব নব লীলায়, নব আঙ্গিকে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। তাদের প্রেম এতটাই দিব্যোন্মাদের ভাবতন্ময়তা সৃষ্টি করে যেখান থেকে তাঁরা নিজসত্তা বিলীন করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। রাধা ও কৃষ্ণ পৌঁছায় প্রেমের উন্নতমার্গে। বিষয়টি থেকে যে তথ্যসমূহ উঠে আসে তা হল—

১. রাধাকৃষ্ণের নয়ন মিলনে প্রেমের সূত্রপাত।

২. নিত্যনব প্রেমজ্বালে তাঁরা বন্ধন প্রাপ্ত হন।

৩. প্রেমের উন্মত্ত অবস্থায় নিজ সত্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত।

এভাবেই তাঁরা প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠায় বিলাসলীলা সম্পাদন করে থাকেন। তাঁদের প্রেমের এই পরিণত রূপই 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত' নামে বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তার এক নতুনতর দিককে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকেই এই অংশের ভাব ব্যক্ত করার অনুভবটিকে 'মাথুর' পর্যায়ের সঙ্গে মিলিত করেছেন। কলিযুগে মহাপ্রভু এবং দ্বাপরে শ্রীরাধাই ছিল কৃষ্ণ প্রেমের মূল আশ্রয়। মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদের স্বরূপ অনুধাবন সাধারণ ভক্তের নিকট অনুমান সাধ্যাতীত। তবে অনেকেই ভক্ত স্বরূপ দৃষ্টি, সেবার আকৃতি নিয়ে সেই ভাব তথা রাধাকৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। তাইতো রামানন্দ মহাপ্রভুকে জানায়—

''যেবা প্রেমবিলাস- বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়।।
এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।।''[১৮]

প্রকৃতপক্ষে নায়ক নায়িকা প্রবল প্রেমের অতৃপ্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে পরস্পরের সুখ বিধানে নানাভাবে একে অপরকে তৃপ্ত করতে চান। রামানন্দের এই বিলাস তত্ত্বে কৃষ্ণ প্রেমকে গুরুত্ব দিলেও পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর আত্মতৃপ্তি হেতু রাধাকৃষ্ণ উভয়েরই বিলাস লীলার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রেমের প্রগাঢ়তায় মিলনের চরম উৎকণ্ঠিত প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। কেলিবিলাসের চরম বাসনায় কান্ত-কান্তা উভয়েরই চৈতন্যবিলুপ্তি হয়ে যায়, এভাবেই প্রেমবিলাস বিবর্তের কথা মহাপ্রভুর নিকট রামানন্দ ইঙ্গিতে প্রতিকায়িত করেছেন। রাধাকৃষ্ণ এই লীলায় একেবারে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। ব্রহ্মের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের অভেদত্ব হওয়ার কারণে জীবের

নিত্যলীলায় অনাদিকাল হতে তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে তারা ভাবগত অর্থে মিলিত হয়েছেন। নারীপুরুষ একে অপরকে পৃথক সত্তায় সুখবিধান করবেন এই ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রেমের প্রবল আবেশে তাদের নিজ সত্তার চরমতম বিলুপ্তি ঘটছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণের যুগ্ম বিলাসলীলায় শ্রীরাধার মধ্যে প্রেমের চরমতম রূপ অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে; আর এখানেই এই বিলাসতত্ত্বের চরম সার্থকতা, প্রেমের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ মিলনের বাসনাও রাধাকে আকুলিত করে তোলে। তাই মাদনাখ্য মহাভাবই হল প্রেমের চরম প্রকাশক একক রূপ। এই চরম প্রকাশই রাধা কৃষ্ণের আত্মসত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। তাই 'বিবর্ত' বলতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ভ্রান্তি, বৈপরীত্য এবং প্রেমের চরম পরিপক্কতা, বিলাস কলায় নানা বৈপরীত্য এনে বাস্তব মিলন প্রদর্শনের সার্থকতাকে সুনিশ্চিত করেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুই এই 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-এর মূল বিগ্রহ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মসত্তা একত্রে বিরাজিত হয়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছে একথাই যেন 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-এর মূল নির্যাস একথা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত:

- শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সর্বঅবতারের আশ্রয়স্থল।
- রাধাকৃষ্ণের যুগল সম্মিলনে ঘনীভূত প্রেমের স্বরূপ।
- পূর্বরাগ-অনুরাগ থেকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত প্রণয়ে উভয় সত্তার বিলুপ্তি।
- কৃষ্ণ প্রেমের গুরুত্ব।
- ব্রহ্ম ও জীবের অভেদত্ব, স্বয়ং চৈতন্যদেব এর মূর্ত স্বরূপ।

প্রেমতত্ত্ব:

'চেতন্যচরিতামৃত'-এ গোপীপ্রেমের আরো গভীরে বিশ্লেষণে উঠে এসেছে প্রেমতত্ত্ব। খুব স্বল্প পরিসরে হলেও আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর তাত্ত্বিক দার্শনিক বিশ্লেষণে এই তত্ত্বটির আলোচনায় মনোনিবেশ করতে চলেছি। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে স্পষ্টতই গোপীপ্রেম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> ''কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
> আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা— তারে বলি 'কাম'।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।''[১৯]

এই প্রেমের মাধ্যমে মনুষ্যকুল সকল আকাঙ্ক্ষা, মোহ, মায়া বন্ধন থেকে এক অনির্বচণীয় লোকে উন্নীত হয়। ঈশ্বর প্রাপ্তিই তাদের একমাত্র প্রাপ্যবস্তু থাকে। জীবকুল সহ সকল কৃষ্ণসেবায় প্রাণাগত সত্তারা তার প্রতি চরম আকর্ষণে যে অভিন্ন একাত্মতা অনুভব করেন, তাতে তারা ঈশ্বররূপী কৃষ্ণকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করেন। তাদের হৃদয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব সাধনভক্তি থেকে এই রতিভাব জাগ্রত হয়। রতি প্রগাঢ় হলে তা থেকে জাগ্রত হয় প্রেম। প্রেম থেকে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব ভক্তের প্রেমকে সার্থকতর হতে বিশেষ সহায়তা করে। কৃষ্ণের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণের অনুভব থেকে জন্ম নেয় স্নেহ। প্রিয়ের নানাবিধ সেবার আর্তি থেকে শুরু হয় মান। ধীরে ধীরে প্রণয়ীর হৃদয় মন, প্রাণ, দেহ কৃষ্ণপ্রেমে একীভূত হয়ে যায়, কৃষ্ণপ্রীতি আরো গভীর হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনায় তাদের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তিকে নিমেষে তুচ্ছ বোধ হয়। রাগ থেকে অনুরাগের মধ্য দিয়ে প্রেম-পরিণতি লাভ করে। জাগতিক সকল দুঃখ তখন তুচ্ছ বোধ হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— স্বরূপ গোস্বামী 'ভাব', 'মহাভাব'কে এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী এই দুই-এর মধ্যে প্রভেদের কথা বললেও এর সঠিক কারণ উল্লেখ করেননি।

শুদ্ধচিত্তেই প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। যার মূল আশ্রয় হল হ্লাদিনী বা আনন্দ। এই হ্লাদিনী শক্তিই জীবের শুদ্ধ প্রেমের অঙ্কুরকে প্রোথিত করতে সহায়তা করে। কৃষ্ণের এই হ্লাদিনীর প্রভাব নিঃস্বার্থ সেবামূলক মনোভাবাপন্ন ভক্ত হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, ফলে সকল ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আকুলিত হয়ে ওঠে। এই প্রেমমার্গের একমাত্র পথিক তারাই হতে পারবে যাদের চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমে প্রকৃত রূপে নির্মল ও পরিশ্রুত।

প্রেমতত্ত্ব :

- গোপী প্রেমের গভীরতর আত্মপ্রকাশ।
- প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথরেখা নির্মাণ।
- হ্লাদিনী শক্তিই প্রেমতত্ত্বের ভিত্তিস্তম্ভ রূপে বিরাজমান।
- কাম থেকে শুদ্ধপ্রেমের যাত্রা।

স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব :

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অন্যান্য সকল তত্ত্বের ন্যায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল 'স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব'। শ্রীরাধা ও অন্যান্য সখীগণের প্রেমের নানা আঙ্গিক বোঝাতে তত্ত্বটির অপরিসীম গুরুত্ব বিদ্যমান। বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ

প্রকার রসের মধ্যে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মধুর রসের দুটি দিক হল স্বকীয়া মধুর রস, পরকীয়া মধুর রস। সমাজ স্বীকৃত সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের প্রতিরূপ স্বকীয়া প্রেম নামে প্রচলিত। এরা সমাজ জীবনে বৈবাহিক ও পতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় সেবাপরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের বৈবাহিক স্ত্রী অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যভামা— এঁরা স্বকীয়া প্রেমের নায়িকা। এমনকি, দ্বারকা ছাড়াও বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মীরাও এই সমভাবাপন্ন। পরকীয়া প্রেমে যেসকল রমণীগণ সমাজ স্বীকৃত নীতি ধর্মের উপেক্ষা করে হৃদয়ের গভীর ঐকান্তিক টানে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, এমনকি যারা সমাজ স্বীকৃত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ নন, তারাই পরকীয়া প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী। তাইতো চরিতামৃতকার যথার্থই উদ্ধৃত করেছেন—

''অতএব 'মধুর-রস' কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি।।''[২০]

অর্থাৎ যে সকল নারী সমাজধর্ম স্বীকৃত পুরুষকে হৃদয়দান করেন তারাই স্বকীয়া, আর যারা বিবাহ বিধি অনুযায়ী পুরুষের পত্নী নন তারাই পরকীয়া নায়িকা। মূলত তত্ত্বটিতে শ্রীরাধার প্রেমের অবয়বকে সুস্পষ্ট পরিকাঠামো দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরই পরকীয়া প্রেম বিষয়টি তত্ত্বে অভিষিক্ত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং স্বীকৃতি দিয়েছেন, মহাপ্রভুই তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পরকীয়া প্রেমের গভীর তীব্রতা তাই সর্ব কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমেই যথার্থ বিকশিত হয়েছে। তাই পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ রাগাত্মিকা রতি বা পরকীয়া রতির যথার্থ বিকাশ। এ নিয়ে বৈষ্ণব গোস্বামীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতবিরোধ পরিলক্ষিত যা স্বয়ং জীব গোস্বামী পরকীয়া তত্ত্বকে সমর্থন করেননি, তিনি বলেছেন রাধার স্বকীয়া প্রেমেই প্রেমের চরমতম প্রকাশ লক্ষিত। এ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে অপ্রকট ব্রজ লীলায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম তাই স্বকীয়া। কিন্তু প্রকট ব্রজলীলা রাধিকা সহ অন্যান্য ব্রজনারীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরকীয়া বিলাস লীলায় উন্মত্ত। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী না হয়েও তারা অতি সাবলীল ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই পরকীয়া নায়িকাকে পদাবলীতে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—

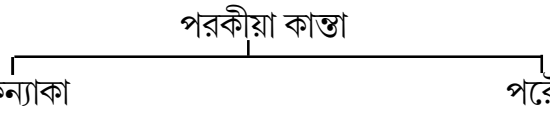

পরকীয়া কান্তা

কন্যাকা	পরোঢ়া
(অবিবাহিতা গোপকন্যা)	(বিবাহিতা রমণী)

অর্থাৎ যে সকল গোপকন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রেমপাত্রী রূপে সামান্যতম সান্নিধ্য পাওয়ার সুখে কোন কিছু না ভেবে কৃষ্ণ প্রেমে চঞ্চল হয়ে ওঠেন তারাই হল 'কন্যাকা' বা অবিবাহিতা গোপকন্যা। আর 'পরোঢ়া' হল বিবাহিতা গোপীগণ, যারা পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করতে ছুটে আসেন। এরা মূলত নিঃসন্তান রমণী এবং রাধিকা এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোপী কান্তা। স্বকীয়া প্রেমে কৃষ্ণ স্বকীয়া কান্তাগণ দ্বারা মধুর রসে তৃপ্ত হন। আর পরকীয়া প্রেমে পরকীয়া মধুররস দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হন। তাই তুলনামূলক বিচারে যে প্রেমে লোকলজ্জার ভয়, পথে দীর্ঘ বাধা, প্রিয় মিলনের আর্তধ্বনি অধিকভাবে অনুরণিত হয় তা হল পরকীয়া প্রেম। তবে ব্রজধাম ছাড়া এর পৃথক অস্তিত্ব নেই। পরকীয়া নারীদের এই উন্মত্ততার পিছনে আছে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ, পরমব্রহ্ম, এমনকি তাঁর হ্লাদিনী শক্তির প্রতি শ্রীরাধাসহ অন্যান্য নারীদের প্রগাঢ় আকর্ষণ। এই তত্ত্বে কৃষ্ণ-আত্মা আস্বাদনের মনোবাঞ্ছাই প্রেমের মাধুর্যকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। রাধাকৃষ্ণ যেহেতু এক আত্মা দুই দেহ ধারী— সে অর্থে স্বকীয়া- পরকীয়া প্রেম প্রকাশে পার্থক্য নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দুজন পৃথক সত্তা, দুটি ভিন্ন দেহধারণকারী। রাধা আয়ানের পত্নী, জটিলা তার শাশুড়ি, কুটিলা তার ননদ। তাই কৃষ্ণের নিকট তাঁর প্রেম সমাজে পরকীয়া রূপেই পরিচিত। হৃদয়ের প্রবল টানে কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের প্রতি শ্রীরাধিকা সংসার ত্যাগিনী এক অভিসারিকা নায়িকা হয়ে ওঠেন। মানবিক প্রেম প্রকাশক সুতীব্র আকুলতা, সকল দুর্যোগ, বন্ধন অতিক্রমকারী হৃদয়ের সম্পদ, বিরহযন্ত্রণা সব মিলিয়ে পরকীয়া প্রেম শ্রীরাধাকে অভিসারী নায়িকায় পরিণত করেছে। সকল জনকলরব, সংসারের মোহজালকে নিমেষেই তাঁর তুচ্ছ মনে হয়। জাগতিক সকল মায়া, সমাজ, সংস্কার, প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা সব কিছু একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরিণত হয়। ঈশ্বর সেবার প্রেক্ষাপটই তাই পরকীয়া প্রেমকে অভূতপূর্ব মহিমা প্রদান করে।

স্বকীয়া কান্তা প্রেমিকাদের সঙ্গে লোকধর্ম ও স্বজনদের বিশেষ অনুমোদন থাকে। সমাজ স্বীকৃত স্বাভাবিক পথে তাদের মিলন হওয়ায় সব কিছুই প্রায় পূর্ব নির্ধারিত থাকে, ফলে সে মিলনে নায়ক নায়িকার উৎকণ্ঠা বা চমৎকারিত্ব কোনোটাই প্রায় থাকে না, যে প্রাপ্তিতে পথের দুর্যোগ, বাধা বিঘ্ন থাকে না সেই প্রাপ্তির মূল্য চরম পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। তাই পরকীয়া নায়িকারা জাতি,

কুল, শীল, মান, সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আর্য পথকে অতিক্রম করে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। তাই সে প্রেমময় মিলনের উৎকণ্ঠা, অপূর্ব চমৎকারিত্বে প্রতিধ্বনিত হয়। ব্রজধাম পরকীয়া প্রেমের প্রধান পীঠস্থান। শুধুমাত্র ঈশ্বরকৃষ্ণকে প্রভুরূপে, প্রাণ সখা রূপে, প্রিয়রূপে তাঁর চরণদাস রূপে প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধা সহ গোপীগণের এই অপ্রাকৃত পরকীয়া তথা ব্রজলীলা সংঘটিত হয়। যদিও এই পরকীয়া প্রেম সমাজ স্বীকৃত না হলেও শ্রীরাধার চরম আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণ সকল গোপীগণের থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী হওয়ার কারণেই তিনি শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা নন, হ্লাদিনী সারভূত মহাভাব স্বরূপা। তাঁর এই পরকীয়া প্রেমলীলা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশেষ রস সংযোজন করেছে।

এই অপার কৃষ্ণপ্রেম, স্বসুখ বাসনা পরিত্যাগ করে প্রেমপাত্রকে অন্বেষণ করার মনোবাঞ্ছায় 'পরকীয়াতত্ত্ব' ভাগবতের বহু স্থানে উঠে এসেছে। এমনকি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বহু ছত্রে সেই সুরের ঝঙ্কার ধ্বনি আমরা বহুক্ষেত্রে অনুভব করেছি। তবে শ্রীরূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তাগণ পরকীয়া প্রেমকে নানাভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। যেহেতু রাধাকৃষ্ণ একই হৃদয়ের অংশ, শুধুমাত্র ভিন্ন দেহধারী, তাই জাগতিক সংসারে আবদ্ধ থেকেও সর্বস্ব ত্যাগ করে ঈশ্বর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করার পথকে সুনির্দিষ্ট করার জন্যই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে পরকীয়া প্রেমরূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। স্বকীয় সকল বিষয় ত্যাগ করে এই ঈশ্বর প্রাপ্তির চরম আকাঙ্ক্ষাময় বাণীই 'পরকীয়াতত্ত্ব' রূপে বিশেষ গতি প্রদান করে এই সাহিত্যতত্ত্বকে নানা আঙ্গিকে যুগযুগ ধরে সমৃদ্ধ করে চলছে; এমনকি আধুনিক কথাসাহিত্যেও জীবন বিশ্লেষণের বহু আঙ্গিকে এই তত্ত্বের সাদৃশ্য বহুক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্ব :

- মধুর রসের আরাধনায় মুখ্য।
- সমাজ স্বীকৃত ও সমাজ ধর্ম অস্বীকৃত প্রেম মার্গের স্বরূপ।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব:

বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনের অনুপ্রেরণা রূপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জ্ঞাত হয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কখনো ভাষণে বা বার্তালাপে যে ধর্মের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাঁর সেই ব্যাখ্যা, আলোচনাকে বৃন্দাবনের শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীগণ যুক্তি-তর্কের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করে সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এর সঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর ব্যাখ্যা ও রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে তাঁর 'ষট্‌সন্দর্ভ' গ্রন্থে যে বিচার ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের

ভিত্তিভূমি রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যাকে ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কের নিরিখে 'অচিন্ত্য- ভেদাভেদ তত্ত্ব' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনের নিগূঢ় আলোচনা থেকে উঠে এসেছে বৈদিক বিষ্ণু, মহাভারতের শান্তি পর্বের নারায়ণীয় অধ্যায়ের নারায়ণ বা হরি এবং পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বাসুদেব কৃষ্ণ, এই সকল দেবতা ক্রমে সর্বকর্তৃত্বময় তথা প্রভাবশালী ঈশ্বরত্বের অধিকারী ছিলেন। সময়ের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এর পরবর্তীকালে ভাগবতীয় ধর্মের মূল পূজ্য দেবতায় এক ও অভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আর এই ধারাপথেই কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা পেয়েছি যুগোত্তীর্ণ বৈষ্ণবীয় ধর্মের নানান প্রস্তাবিত শাখা প্রশাখাকে; মূলত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর থেকেই বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা লগ্ন বলে বিবেচিত হয়। যিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের যাত্রাপথকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করলেন। তাইতো বলা হয়েছে কৃষ্ণলীলার সমানুপাতে চৈতন্যলীলা ধ্যেয়, 'কৃষ্ণতত্ত্ব'-এর সমান্তরালে 'চৈতন্যতত্ত্ব' জ্ঞেয় বস্তু। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণের প্রতিটি ছত্রে একদিকে যেমন দুরূহতা, জটিলতা, মতানৈক্য বিদ্যমান তেমনি জীবনের ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা বাণীর শ্রুতধ্বনি অনুসৃত হয়। যে তত্ত্বে ভগবান কৃষ্ণরূপী পরমাত্মাকেই ত্রিবিধ শক্তির পরাকাষ্ঠায় গ্রথিত করেছেন। প্রথমত স্বরূপশক্তি, দ্বিতীয়ত জীবশক্তি, তৃতীয়ত মায়াশক্তি—এই তিনটি শক্তির সমাহারেই ব্রহ্ম। পরমাত্মার অস্তিত্বকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে অন্তরঙ্গ লীলা, জীবের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ ও সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নির্গুণ ব্রহ্মকে বা আত্মাকে এ তত্ত্বে ভগবানের অংশ মাত্র রূপে অবতারণা করা হয়েছে। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ'-এ ব্রহ্ম শক্তির উল্লেখ আছে, 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে শুরু করে, 'পঞ্চরাত্র সংহিতা'-য়, এমনকি 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ রামানন্দ রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নানা দিককে ইঙ্গিতায়িত করেছেন। রূপ ও জীব গোস্বামী পরবর্তীসময়ে এই তত্ত্বকে বহু ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায়িত করে পাঠক সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। ভাগবতীয় নির্গুণব্রহ্ম, পরমাত্মা ও সবিশেষ ভগবান এই তিনটি তত্ত্বের কথা উল্লিখিত হলেও প্রথম দুটি তত্ত্বে ভগবানের অসমাপ্ত রূপকে তুলে ধরা হয়েছে, যার ব্যাখ্যায় বলা আছে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্রহ্ম উপলব্ধি করে শোক ও সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই জীবাত্মাকে মুক্তিকামী পথে অগ্রসর করে। একটি সাধনা থেকে অপর এক সাধনার স্তরে এই ব্রহ্মজ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়েই যাওয়া সম্ভব।

আর এভাবেই আমরা ঈশ্বর ও জীবের দ্বৈত সম্বন্ধকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, যেখানে

উভয়ের মধ্যে একদিকে যেমন ভেদ আছে, তেমনি অপরদিকে অভেদও আছে; এই ভেদ ও অভেদের অচিন্ত্য সম্বন্ধের পরাকাষ্ঠায় জীব গোস্বামী নির্ণীত করলেন 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব'-কে, যেখানে ভগবান সর্বশক্তিমান এমনকি বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্পর্কিত গ্রন্থ আহরিত তথ্য থেকে জানা যায় 'উপনিষদ'-এ ব্রহ্মশক্তি, 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ বিভিন্ন শক্তির নামাঙ্কণ করা হয়েছে, এমনকি 'পঞ্চরাত্র সংহিতা'-য় বিষ্ণুর নানা শক্তির উল্লেখ থাকলেও মূলত চৈতন্যর কাছে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব জনিত ব্যাখ্যা করলেন রামানন্দ রায় মহাশয়, তাঁর ব্যাখ্যাই হল সর্ব প্রথম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব দর্শন'-এর প্রধান পথ মার্গের সূচনালগ্ন। ব্রহ্ম উপলব্ধির পথেই মানুষের শোক তাপ আকাঙ্ক্ষা পরাভূত হয়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের যোগ্য ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ এইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের মত, উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্তমান।

মহপ্রভু চৈতন্যের লৌকিক ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর ভাষণ তথা আলাপে যে ধর্মের স্বরূপ পরিস্ফুট তাই হল 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দর্শন।' আর এই ধর্ম দর্শনকে তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দুই ভাই শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এবং তাদের ভাইপো শ্রীজীব গোস্বামী। এই দর্শন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবজগতের নিবিড়তম সম্পর্ককে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে নাম দেওয়া হয়েছে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব'। এর অর্থ হল ঈশ্বর জীবে ভেদ এবং অভেদ দুই সম্বন্ধই বর্তমান। কিন্তু কখনো সে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে তাই 'অচিন্ত্য' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত অনুযায়ী ব্রহ্মই সর্বশক্তিমান। তিনিই ঈশ্বর বা ভগবান, এই ঈশ্বরের তিনটি শক্তি। 'সন্ধিনী', 'সংবিৎ' এবং 'হ্লাদিনী'। এই তিনটি শক্তির মিলিত রূপই 'অন্তরঙ্গা' শক্তি। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'গীতা', 'ভাগবত' থেকে 'উপনিষদ' পর্যন্ত এর ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ'-এর একটি উদ্ধৃতি—

''ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।''[২১]

অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজ কার্যশক্তি বলে কিছু নেই। তার থেকে অধিক বলশালী কিছু নেই। এর বিভিন্ন পরাশক্তির স্বাভাবিক জ্ঞানবল ক্রিয়া শক্তির কথা আমরা শুনে থাকি মাত্র। 'পঞ্চরাত্র'-এ বলা হয়েছে ঈশ্বরের আত্মশক্তি প্রলয়কালে ম্রিয়মান থাকলেও প্রলয়ান্তে তা বিদ্যুৎগতিতে স্ফূরিত হয়। সকল বস্তুর মধ্যেই শক্তি অচিন্ত্য রূপে বিদ্যমান যা ঐ বস্তুর সঙ্গেই একীভূত ভাবে মিলিত থাকে। শক্তি সেই বস্তুর সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তাই বলা যায় পদার্থের যে শক্তি তা

যেমন একদিকে স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, তেমনি ব্রহ্মার সৃষ্টি বা তার শক্তি ও দৃষ্টি স্বাভাবিক পথে কোন ভাবেই গ্রাহ্য নয়। 'বিষ্ণুপুরাণ' মতে বিষ্ণুর তিনটি শক্তির স্বরূপকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা গ্রহণ করেছেন—

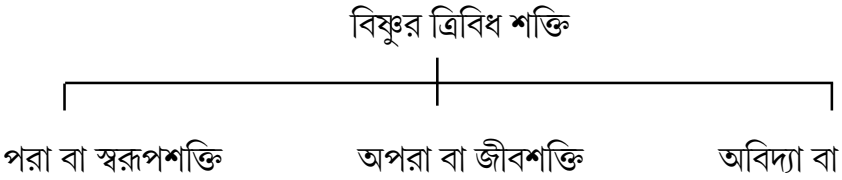

বিষ্ণুর এই 'পরা শক্তি'র পরিচয় দিতে গিয়ে পুরাণে তাই বলা হয়েছে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সংবিৎ' এই তিন শক্তির একত্র প্রকাশ ভগবানের আশ্রয় স্বরূপে। লীলার প্রয়োজনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ত্রিবিধ শক্তিতে রূপ দিয়েছেন— ১. আনন্দাংশে হ্লাদিনী, ২. সদংশে সন্ধিনী ৩. চিদংশে সংবিৎ। এই 'অন্তরঙ্গা' শক্তির পাশাপাশি ঈশ্বরের আরো দুটি শক্তি বিদ্যমান-১. জীবশক্তি ২. মায়াশক্তি; বৈষ্ণব দর্শনে এই জীব শক্তিকেই বলা হয়েছে 'তটস্থা'। তাই 'ভগবদ্গীতা'-র সপ্তম অধ্যায়ে মায়াশক্তির স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে— ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার— এই হল আট প্রকার অপরা অর্থাৎ জড়প্রকৃতি। আর এ থেকে ভিন্ন এক রূপ হল পরাপ্রকৃতি তা হল জীব বা চেতনা, যা এই সৃষ্টিকে ধারণ করে রেখেছে।

গীতার উক্ত অধ্যায়ে মায়াশক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে— ঈশ্বরের এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা দুরাতিক্রম্যা। একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হলেই মায়ার বন্ধন কাটানো সম্ভব।

এই তিন প্রকার শক্তি বিভাগের উপর দণ্ডায়মান বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম দার্শনিক তত্ত্ব 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব'— আর এখান থেকে সূত্রপাত হয় বাঙালি প্রাণের অন্যতম বৈষ্ণবীয় অভিলাষিত পরমপূজ্য পরম পুরুষার্থ প্রেমভক্তির অবিরাম ফল্গুধারার।

'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব'-এর অন্যতম জীবশক্তি বা তিনটি গুণের ব্যাখ্যায় বলা যায় ব্রহ্মকেই সর্বগুণের আধার সৎ, চিৎ এবং আনন্দ অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সৎ অবলম্বনে সন্ধিনী যা কিনা ঈশ্বররূপী কৃষ্ণসত্তার বহিঃপ্রকাশ; এই বহিঃপ্রকাশ বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা সহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে ঘটে। 'সংবিৎ' হল সম্পূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্রিক বিষয়, যা ভগবান

নিজে জানেন ও অন্যকে জানতে সাহায্য করেন। আর 'হ্লাদিনী' হল বৃন্দাবনের গোপীগণ ও শ্রীরাধার সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা খেলার আনন্দাত্মক অনুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই মধুর লীলা খেলাই নিতান্ত অভিপ্রেত শ্রেষ্ঠ লীলা। কৃষ্ণের এই আনন্দাত্মক লীলা প্রকট রূপে বৃন্দাবনে, অপ্রকট রূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যপ্রবহমান। এই লীলার অতৃপ্ত বাসনা থেকেই জীবকুলকেও এই লীলার অংশীভূত করতে চেয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কারণ জীবকে সমগ্র জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করার আনন্দেই এই লীলা অনুষ্ঠিত হয়। আর একে চরিতার্থ করবার হেতু 'মায়া' ও 'জীব'— এই দুই শক্তির আবির্ভাব।

'হ্লাদিনী' শক্তির প্রসারে ভক্ত লীলায় অংশগ্রহণ করে চিদংশে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অঙ্গীভূত হয়ে কৃষ্ণসেবায় আত্মসমর্পণ করে এবং তার পরিবর্তে অপার আনন্দানুভূতির অংশীদার হওয়া জীবের প্রাপ্য। আর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ হল সেই প্রকট লীলার অন্যতম তীর্থক্ষেত্র; যেখানে ভক্তদের জন্য বৃন্দাবনে তিনি স্বরূপ অবতারে এবং নদীয়ায় তিনি চৈতন্য অবতারে আবির্ভূত হয়ে ভক্তদের উদ্ধারে প্রকট লীলাকে অব্যাহত রেখেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতে ব্রহ্মার সঙ্গে সামান্য হলেও জীবের যোগসূত্র বিদ্যমান। তাত্ত্বিকেরা অনু বা সামান্য অংশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দুই অংশের মিলিত রূপকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে। এদের মধ্যে একদিকে যেমন ভেদ আছে তেমনি অন্যদিকে অভেদও বিদ্যমান— রাধাকৃষ্ণের মধ্যে এই অভিন্নতা তথা ভক্ত ভগবানের মধ্যে এই অভিন্নতা যেন শক্তি ও শক্তিমানের সম্পর্ককেই মনে করায় অথচ ভক্তিমতে জীব ও ব্রহ্মার পার্থক্য বিদ্যমান। এভাবেই ভেদ অভেদ ব্যাখ্যায় বলা যায়— অগ্নি ও অগ্নি জ্বলন কার্যকারণ সূত্রে অভিন্ন কিন্তু বস্তু হিসেবে তারা ভিন্ন। এভাবেই জীব শক্তি ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্পর্ক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' সম্পর্ক। জীবের এই কৃষ্ণ সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, বশীভূত। এই অর্থে রাধা পূর্ণ-শক্তি আর কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান, রাধাকৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের আস্বাদ্য।

তাই জীব গোস্বামীর মত অনুযায়ী আমরা 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' তত্ত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যা জ্ঞান, যুক্তি ও তর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না অথচ যাকে প্রত্যক্ষ সত্য রূপে স্বীকৃতি দিতে হয় তাই হল অচিন্ত্য জ্ঞান। 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ কথিত বস্তুর শক্তির জ্ঞানই অচিন্ত্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদের সম্পর্কটি অচিন্ত্য ব্যাপার। তাই এই সম্পর্ক অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্পর্ক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন জীব ও ঈশ্বরের এই ভেদ-অভেদ কেন্দ্রিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে। জীব গোস্বামীর বক্তব্য থেকে আরো স্পষ্ট হয়েছে জীব শক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের

অংশই হল জীব। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। কৃষ্ণ ও রাধিকায় কোন ভেদ নেই। শুধুমাত্র লীলারস আস্বাদনের হেতু তারা পৃথক রূপ ধারণ করেন মাত্র। জীবতত্ত্বে কথিত ব্রহ্মের 'স্বরূপশক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি' এই তিন শক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই শক্তি ও শক্তিমান অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বাস্তব ব্যাখ্যায় পরিশেষে একথাই উঠে আসে— বৈষ্ণব ধর্ম উদার ও মানবিক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভক্তকেই এই ধর্ম স্বাগত জানায়। যারা সমাজে অবহেলিত তারাও কৃষ্ণ সেবা থেকে কখনো বঞ্চিত হবেন না। তাই দার্শনিক দিক থেকে মোক্ষলাভ নয়, ভক্তিমার্গের পথ বেয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত হওয়াই এই ধর্মের মূলবাণী। তাইতো মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রার্থনায় বলেছেন— তিনি ধন চান না, জন চান না, মনোহরিণী কবিতাও চান না, শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে অহৈতুকী ভক্তি কামনা করেন। সকল যুক্তিতর্ক রোহিত এই তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বগত ভিত্তিকে অনেক বেশি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব:

- ঈশ্বর ও জীবের দ্বৈত সত্তার উপলব্ধি।
- উভয়ের পৃথক অস্তিত্ব ও অভিন্নতা বিদ্যমান।
- ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান।
- পরমব্রহ্মের শক্তি অন্তরঙ্গা, জীব ও মায়া শক্তির উপর দণ্ডায়মান।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব:

প্রাগাধুনিক যুগের এক অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন হল বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদ সাহিত্য। এই তিনটি শাখার মধ্যে বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীতে উন্মুক্ত মানবধর্মের এক অভূতপূর্ব বিচরণ ক্ষেত্র লক্ষ্যগোচর হয়েছে। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেন্দ্রিক ধর্ম ও তত্ত্ব দর্শনগত দিক মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে এক বৃহৎ মানবতার ভাবসমুদ্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবপদাবলীতে সে অর্থে তত্ত্ব-দর্শনগত দিক প্রভাব বিস্তার না করলেও তার এক ভিন্ন মাত্রার আবেদন ছিল ঠিকই তবে চৈতন্যমহাপ্রভুর নবজাগরণিক আবির্ভাবের ফলে এক নতুনতর তত্ত্ব-দর্শনগত পটভূমি রচিত হল। সেই তত্ত্বতে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' অপেক্ষা 'কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতি-ইচ্ছা' অর্থাৎ প্রভুকে সেবার মনোভাব উঠে এল। চৈতন্যদেব নিজ জীবনকে বৈষ্ণবীয় ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে এমন ভাবে সম্পৃক্ত করলেন, যেন স্বয়ং তিনিই হয়ে উঠলেন কৃষ্ণভাবদ্যুতি-সুবলিত-কৃষ্ণস্বরূপ, যেখানে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রগাঢ় সাধনার মার্গকে বেছে নিলেন তিনি। তাইতো

বলা যায় কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তারূপ ভক্তের বিপ্রলম্ভ সম্ভোগাত্মক নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দপূর্ণ মিলনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম বিষয়। প্রেমপুরুষ কৃষ্ণের জন্য সর্বোচ্চ সাধ্যসাধনের পথই বর্তমান আলোচ্য বৈষ্ণবতত্ত্বের বিশ্লেষণের বিষয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে এই তত্ত্ব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। গোদাবরী তীরে রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দকে বিবিধ প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা প্রতি আলোচনা থেকেই এই তত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। প্রভু জানতে চেয়েছিলেন আমাদের জীবনের সাধ্যবস্তু কি বা সাধন মার্গই বা কি? রামানন্দের ব্যাখ্যাই চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তার হৃদয়কে কৌতূহল নিবৃত্তি ও সবৈব প্রশান্তি এনে দিয়েছিল, একথা বলা যায়।

আত্মসুখের মাধ্যমে জীব প্রাথমিক অবস্থায় পরিতৃপ্ত হলেও তার ব্যাপ্তি সুগভীর নয়। কারণ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে যে সুখ হয়, বা যে সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হয় তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের। বহু মানুষের কাছে তাই সাধ্যবস্তু কাম, অর্থ, ধর্ম প্রভৃতি হয়ে থাকে। অনেকেই জাগতিক মোহবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য মোক্ষ কামনা করেন। বৈষ্ণবীয় ধর্মমত অনুযায়ী ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোনটিকেই 'সাধ্যবস্তু' বা 'পুরুষার্থ' বলে মনে করা হয় না। তারা বলেছেন, প্রেমময় কৃষ্ণ প্রাপ্তিই হল চরম 'সাধ্যবস্তু'। তাই জীবের জীবদ্দশায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য, সৌন্দর্য, আস্বাদন ও সেবা প্রাপ্তিই জীবমুক্তির একমাত্র পথ।

> ''কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
> কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয়।।
> কিন্তু যার সেই ভাব— সে-ই সর্ব্বোত্তম।
> তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম।।''[২২]

এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে তাই রামানন্দ বললেন 'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়', সকল কর্মে কৃষ্ণকে অন্বেষণ, স্বধর্মত্যাগ করে, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির পরাকাষ্ঠায় আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের মত সাধ্যবস্তুর নিকটস্থ হওয়া সম্ভব। এমনকি চৈতন্যদেব এসকল বিষয়কে 'এহোবাহ্য' বলে আরো গভীরে প্রবেশ করতে চাইলে রামানন্দ জ্ঞানশূন্য অভিব্যক্তির কথা বলেছেন। কারণ আসলে স্বধর্মাচরণে বর্ণপ্রথার প্রসঙ্গ থাকে। কর্মবন্ধনে স্বার্থ সম্মিলিত ভাবে কর্মে অর্পণ করে কৃষ্ণ জ্ঞাত হয়, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই মুখ্য হয়ে ওঠে, ভক্তির গুরুত্ব হ্রাস পায়। তাই জ্ঞানশূন্যাভক্তি, প্রেমভক্তি, এসকল বিষয়ই চৈতন্যর কাছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হয়েছে। কারণ জ্ঞান শূন্য ভক্তিতে

ঐশ্বর্যময় ব্যাপ্তি থাকে না। প্রেমভক্তিতে প্রেম সম্বন্ধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই চৈতন্যদেব প্রেমকেই সাধ্যবস্তুর পর্যায়ে চিহ্নিত করেছেন।

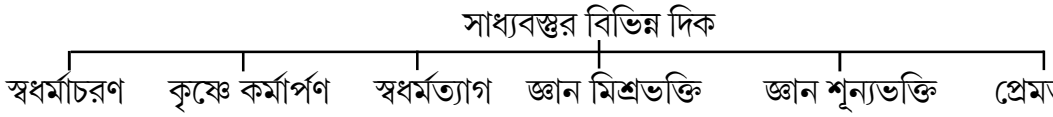

এই ছয়টি বিষয়ের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি চৈতন্যদেবের কাছে 'এহোবাহ্য' মনে হলেও প্রেমভক্তিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায়, প্রেমের কতগুলি দিককে পরবর্তীকালে আলোকপাত করা হয়েছে—

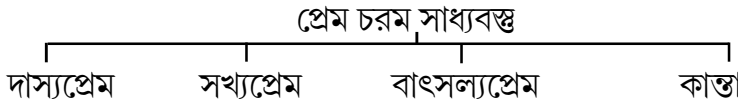

দাস্যপ্রেমে সম্পর্ক স্থাপিত হলেও, তাতে প্রেমের চরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিষয়টি সে অর্থে প্রকাশিত না হওয়ায় একে বাহ্যজ্ঞান মনে হয়েছে চৈতন্যদেবের। এরপর প্রসঙ্গক্রমে সখ্যপ্রেমের কথা ও বাৎসল্য প্রেমের উদারতায় বা প্রগাঢ়তায় একে 'এহোত্তম' মনে হয়েছে; কারণ দাস্য ভাবের হীনমানসিকতা বা সংকোচবোধ সখ্য বা বাৎসল্য প্রেমে অনেকটাই বিলীন হয়ে প্রেমের মহিমা একধাপ বিস্তৃত হয়েছে। তাই সর্বশেষ কান্তাপ্রেমকেই চৈতন্যদেবের 'সর্বোত্তম' মনে হয়েছে। এর কারণ প্রেমের সর্ব মহিমাময় ব্যাপক প্রকাশের পূর্ণতম রূপ এই কান্তাপ্রেমেই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

''প্রভু কহে- এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।।''[২৩]

এ কান্তাপ্রেম কেন শ্রেষ্ঠ? এর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য— সকল প্রেমের গুণ এখানে সম্মিলিত। এক অভাবনীয় মধুর রসের সমাবেশ এই কান্তা প্রেমের সর্বত্র বিরাজিত।

''গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।''[২৪]

তাইতো মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের সকল কান্তাগণের মধ্যে রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রেম সকল সাধ্যশিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণের সকল আনন্দাংশের মূল হলেন শ্রীরাধা। যার প্রমাণ 'গীতগোবিন্দম্', 'ভাগবত' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর মত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। রামানন্দও এর প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁর সকল লীলারসের কেন্দ্রে শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হয়ে

প্রকৃত প্রেমবস্তুকে অনুভব করে কৃতার্থ হয়েছেন। রাধাই তাঁর হ্লাদিনীর সহায় স্বরূপিনী। তাই তো চরিতামৃতকার যথার্থই উপমা দিয়েছেন—

''যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য— মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য।।''[২৫]

তাই মহাভাব স্বরূপিণী, সর্বসাধ্যশিরোমণি রাধার প্রেমকেই গুরুত্ব দিয়ে মধুর রসাশ্রিত কান্তা প্রেমকেই চরম সাধ্যবস্তু মনে করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। কান্তাপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যেহেতু সর্বকান্তা শ্রেষ্ঠা, তাই চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিলাসের সঙ্গিনীরূপে তাকেই শিরোমণি মনে করেছেন। এখান থেকেই জন্ম হয়েছে 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত তত্ত্ব'-এর। তাই সাধ্যবস্তুর ইঙ্গিতে বলা হয়েছে—

''পহি লহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।।
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মম মনোভব পেষল জানি।।''[২৬]

তাই চরমসাধ্যবস্তু প্রেমকে অনুভব করা তাকে প্রাপ্তির বাসনায় রাধাকৃষ্ণ যেরূপ উন্মুখ, ঠিক তেমনি মহাপ্রভুও রামানন্দের কাছে এই সাধ্যবস্তুর সাধনার পথ জানতে উন্মুখ হয়েছেন। কারণ যে কোনো সাধ্যবস্তু সাধনার ফলেই পাওয়া সম্ভব।

''প্রভু কহে— সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।।
সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়।।''[২৭]

এবার সাধনমার্গের আলোচনায় চৈতন্যদেব রামানন্দের কাছে তার উৎসের কথা জানতে চাইলে, রামানন্দ বলেন শ্রীরাধা ও সখীদের বিশেষ ভূমিকার কথা। রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির পথে যে লোকধর্ম, বেদধর্ম, আত্মসম্মান ত্যাগের যে নিদারুণ যাতনা সহ্য করেছে তা সাধারণ জীবের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, তাইতো তাদের লীলা এত মধুর। সমস্ত সখীগণ তাই কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করলেও রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়েই আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তাই সকল জীবকুল চূড়ান্ত মধুর প্রেমের স্তরে উপনীত হতে না পারলেও রাগানুগা ভাবে আরাধ্য দেবতাকে লাভ করতে পারবে। এই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে আস্বাদন করাই হল

সাধ্য ও সাধনার বিষয় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীবকুল তাই এই প্রেম সর্বাংশে না হলেও খানিক উপলব্ধিতেই আত্মসুখ বোধ করে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমালাভের উপায়ই ভক্তহৃদয়কে সাধন মার্গের দিকে নিয়ে যায়। শ্রীরাধা ও সখীগণ ব্যতীত অন্য কোন ভক্তপ্রাণের কৃষ্ণলীলায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। সখীরা শুধুমাত্র তাদের লীলাখেলায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, ফলে তারা তাই রাধা অনুগত প্রেমের অধিকারিণী হয়ে রাগাত্মিকা সাধনার মধ্য দিয়ে সাধনার পথে উন্নীত হতে পারে। সখীভাবে ভজনার মধ্য দিয়েই তাই মধুর কান্তা প্রেমের দুয়ারে জীবকুল উপনীত হতে পারে—

''সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।''[২৮]

সেই কারণে চৈতন্যদেব রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে নিজরস আস্বাদনের জন্য কলিযুগে এক মহামানবের অবতারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর রাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমে ত্রিভুবনের সকল জীব উদ্ধারের হেতু তার আগমন। এই মহাভাবের অনুভবে চৈতন্যদেব বিস্মিত হয়ে রামানন্দকে আলিঙ্গন করেন। প্রবল আবেগে তিনি রামানন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাইতো পরিশেষে বলা যায়—

''কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?।
কৃষ্ণ-ভক্ত প্রেমবলি যার হয় খ্যাতি।।
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সে-ই বড় ধনী।।''[২৯]

নানা উপমায় শোভিত তত্ত্বটি মহাপ্রভুকে সকল সংশয় থেকে মুক্তি দেওয়ার পর তাঁর সকল অঙ্গকে মোহাবিষ্ট করে, তিনি স্বয়ং নিজ মুখ আচ্ছাদিত করে সম্পূর্ণ ভাবে ভাবিত হয়ে তত্ত্বটির মধ্যে এক অভিনব নাটকীয়ত্ব ও প্রাণ স্পন্দন ঘটিয়েছেন। এক অনন্য জীবন বাস্তবতা বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের এই তত্ত্বটির ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত হয়ে কাব্যময়তা সৃষ্টি করে সাহিত্য সম্পদ রূপে একে সমৃদ্ধ করেছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব :

- প্রেমময় কৃষ্ণপ্রাপ্তিই চরম সাধ্যবস্তু।

- কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ।
- রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনই সাধনার বিষয়।

সহজিয়া বৈষ্ণবতত্ত্ব:

বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের আরো একটি পৃথক আঙ্গিক রূপে স্থান পেয়েছে 'বৈষ্ণব সহজিয়া' ধর্মমত। সহজিয়া পন্থীরা এমন এক ধর্ম সম্প্রদায় যারা সহজ পথে ঈশ্বর আরাধনা করেন। 'সহজ' শব্দের অর্থ যা তৎক্ষণাৎ জন্ম হয়, তেমনি জীব ও জড়ের বাহ্যরূপের অন্তরালে অন্তর্নিহিত একটি সত্তার জন্ম হয়, যার উপলব্ধিই হল 'সহজ' ভাবের সাধনা। এমনকি জীব এই ভাবনায় আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হন। ঈশ্বর তাদের কাছে পরম জ্ঞানের বিষয়, যাকে তারা দেহের অস্তিত্বে অনুভব করেন। তাই সহজিয়া ধর্মাবলম্বীদের কাছে তাদের দেহ চেতনাই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ। দেহগত চেতনা বা পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়েই যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব, তাই হল 'সহজিয়া সাধনা'। এই ধর্মমত কেন্দ্রিক যে সাহিত্য তাই পরবর্তী সময়ে সহজিয়া সাহিত্যে প্রতিপাদিত হয়েছে।

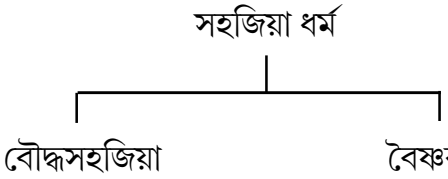

'বৌদ্ধ সহজিয়া'র উদ্ভব 'ব্রজযানী' বৌদ্ধদের থেকে, এর অনুকরণে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের উৎপত্তি। বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ 'সহজযান' নামে পরিচিত, যার সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাপদ', 'নাথ সাহিত্য' যেখানে নির্বাণ লাভের পথে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অন্যদিকে 'বৈষ্ণব সহজিয়া' ধর্মের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়— মূলত বড়ু চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনীর যে সম্পর্ক তা এর ভিত্তিমূল প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করে। এর দীর্ঘ বছর পর খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবরা এই তত্ত্বকে সাধনার অন্যতম মার্গ রূপে নির্বাচন করেন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' থেকে এই মতাদর্শ স্বতন্ত্র। দৈহিক চেতনাকে মূল রূপে প্রোথিত করে বাস্তব জীবনে একে স্থান দিয়েছেন এই মতে বিশ্বাসী বৈষ্ণবপন্থীরা। রাধাকৃষ্ণের একত্র অবস্থানে, নিমাই-নিতাইচাঁদের নাম স্মরণের মধ্য দিয়ে মনোমার্গের বৈদেহী সাধনা ও দেহমার্গের মহাসুখ উপলব্ধি করেই ঈশ্বর সাধনার নিকটবর্তী হতে চেয়েছেন। তারা বিশ্বাস করেন প্রত্যেক নরের দেহ রূপে কৃষ্ণ ও প্রত্যেক নারীর দেহ রূপে রাধার অবস্থান। তাদের একে অপরের সান্নিধ্যই 'মহাভাব' বা 'সহজানন্দ'-এর পথরেখাকে প্রশস্ত করে।

এই বৈষ্ণব মতাবলম্বীরা কামকে প্রেমে রূপায়িত করেন। 'রস' ও 'রতি' কে প্রতীক রূপে নির্বাচন করে তারা রাধাকৃষ্ণ লীলাকে মর্ত্যরসে জারিত করেছেন। নরনারীর উপর রাধা-কৃষ্ণের যুগ্ম সত্তাকে আরোপ তত্ত্বের পরাকাষ্ঠায় বিচার করে মানবদেহের 'রস', 'রতি'কে তার সঙ্গে যুক্ত করে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকেরা। নরনারীর এই 'রতি'কে 'কাম' থেকে 'প্রেম'-এ পরিণত করাই 'বৈষ্ণব সহজিয়া' ধর্মের মূল মন্ত্র। তবে এই সাধনার পথ বহুল প্রতিকূলতা, প্রলোভনের আকর্ষণ দ্বারা কণ্টকিত হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত সাধ্যবস্তু লাভে বহু বাধার উৎপত্তি হয়। হৃদয়ের একাগ্র স্থিরতা ও ঈশ্বর চেতনার দ্বৈতসত্তার মেলবন্ধনে যা লাভ করা সম্ভব। তবে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' মতে বিশ্বাসীরা এই মতাদর্শকে খানিক হীন দৃষ্টিতে প্রতিপন্ন করেন এর দেহতত্ত্বগত পরকীয়া দেহসাধনার দিকটি বিবেচনা করে। আর এখান থেকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও দর্শনগত প্রেক্ষাপট। এই মতাদর্শের বিশ্বাসী ধারা থেকে দুটি সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথমত পদাবলী সাহিত্য— বিদ্যাপতি, রূপ গোস্বামী প্রমুখদের ভূমিকা যেখানে বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত নিবন্ধ সাহিত্য, যার নিদর্শন পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায়। বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাস', যুগলকিশোর দাসের 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরসাবলী', নরোত্তম দাসের 'রাধা-রস-কারিকা', 'দেহকড়চা' এছাড়াও 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়', 'রতিবিলাসপদ্ধতি', 'রাগময়ীকণা', 'রত্নসার' প্রভৃতি। এই তত্ত্বেরই এক ব্যাপক অংশ আধুনিক কথাসাহিত্যে— বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ কথাসাহিত্যে নানা অনুষঙ্গ, আভাস-ইঙ্গিত থেকেছে; তবে বিশেষত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসে ও ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট রূপে বাংলা সাহিত্যকে ব্যতিক্রমী মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এ বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এভাবেই তাত্ত্বিক দিক থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের বহুদিক বিবেচনা করে এর অন্তর্নিহিত অর্থে উপনিত হওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আদি-লীলা), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৩৪-২৬৯

২. 'বৈষ্ণব পদাবলী', ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: শুভ রথযাত্রা, ১৪১৯, পৃ. ২০।

৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আদি-লীলা), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৭৪

৪. তদেব, পৃ. ৩০৫-৩০৮

৫. তদেব, পৃ. ৩১৪

৬. তদেব, পৃ. ৩৩৮

৭. তদেব, পৃ. ৩৪৪-৩৪৮

৮. তদেব, পৃ. ৩৮৯

৯. তদেব, পৃ. ২৭৯

১০. তদেব, পৃ. ৩০০

১১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (মধ্যলীলা : প্রথম খণ্ড), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

১২. তদেব, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

১৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আদি-লীলা), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬০

১৪. তদেব, পৃ. ৩৭৩

১৫. তদেব, পৃ. ৩৭২

১৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (মধ্যলীলা : প্রথম খণ্ড), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২০-৩২১

১৭. তদেব, পৃ. ৩৪৬-৩৪৯

১৮. তদেব, পৃ. ৩৩৮-৩৪৪

১৯. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আদি-লীলা), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬০

২০. তদেব, পৃ. ২৭২-২৭৪

২১. 'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ', ড: ক্ষুদিরাম দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম পুনর্মুদ্রিত দে'জ সংস্করণ: বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১১৬

২২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (মধ্যলীলা : প্রথম খণ্ড), রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২১ চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৮৭

২৩. তদেব, পৃ. ২৮৪

২৪. তদেব, পৃ. ২৮৮

২৫. তদেব, পৃ. ২৯০

২৬. তদেব, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮

২৭. তদেব, পৃ. ৩৬১-৩৬২

২৮. তদেব, পৃ. ৩৬৩

২৯. তদেব, পৃ. ৩৭৫